শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ (ঘটক) গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটী
৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

এই পুস্তক প্রকাশনায় আমাদের বহু সুধীহিতৈষী বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

লিপিকার

শ্রীপ্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়

অনুলিপিকার

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল

অনুলিপি প্রতিলিপিকার

কুমারী মীরা সরকার

দীপিকা সংযোজক

শ্রীমানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ (ঘটক) গঙ্গোপাধ্যায় ধীমান্-ত্রয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

গ্রন্থপ্রসঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি 'জীবনের ঘটনাবলী' বলিতে দৈনন্দিন ঘটনার সমাবেশ নহে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার অনেক সময় সারদানন্দ স্বামীর সহিত একত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে, সাধু ও কর্মজীবনে পরস্পরে যে সব আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল ও গ্রন্থকার স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, চিন্তা ও অনুধ্যান করিয়া তিনি এই রচনাতে তাহারই রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সাধারণতঃ সাধকদের অন্তর্-রাজ্যের অনুভূতিসমূহের বহিঃপ্রকাশ এত সামান্য যে, সাধারণ লোকে তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারে না। তবে, চিন্তাশীল ও দার্শনিকগণ পুনঃ পুনঃ চিন্তন ও অনুশীলনের দ্বারা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সহায়ে 'এই পণ্ডিত কর্মী সাধক মহাপুরুষের সামান্য কয়টি বহির্জগতের ঘটনা-ইঙ্গিত লইয়া তাঁহার অন্তর্জগতের একটি রূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের যে শক্তি আজ বিশ্ব-ব্যাপ্ত, সে শক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে। সারদানন্দ স্বামী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সেবা ও

ত্যাগতপস্যায় জমাট ভালবাসার যে বিগ্রহ সাক্ষাৎ রূপধারণ করিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়—ধ্যানের বস্তু। তাঁহার সাধনার মর্মবাণী ছিল 'সেবা ও ভালবাসা'। প্রথম অবস্থায় যে কয়টি সংসারত্যাগী যুবক, বিনা সহায়-সম্বলে কৌপীনমাত্র আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধাশনে অনশনে নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়া একপ্রাণ, একমন, এক উদ্দেশ্য লইয়া শেষে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন, সারদানন্দ স্বামী তাঁহাদের একজন।

আর একটি কথা, পূজনীয় গ্রন্থকার ও শরৎ মহারাজের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' প্রসঙ্গে যে সমস্ত সমালোচনা ও গবেষণা হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে খৃষ্টীয় ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দর্শনের গভীর তত্ত্ব। খৃষ্টধর্ম যে, হিন্দু তথা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত, সে পরিচয় শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ও শরৎ মহারাজের আলোচনায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ঘটনাপারম্পর্য ও ঐতিহাসিক সময়নির্দিষ্টতার যথাযথ মিল নিয়ে কোথাও কোথাও যে মতান্তর লক্ষিত হয়, সে সম্বন্ধে পরিশেষে 'দীপিকা' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রীতিনিলয় শ্রীযুক্ত মানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সারগর্ভ দীপিকা সংযোজনায় অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দীপিকা প্রকাশন ও পরিশিষ্টাংশে উদ্ধৃত গ্রন্থকারের ভাষণ, আমার মনে হয়, সংশ্লিষ্ট ও তুলনামূলক আলোচনায় স্বাধ্যায়গণের প্রদর্শিকা-স্বরূপ হইবে।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় পূজনীয় গ্রন্থকার-মুখে বক্তৃতাকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের নিকট নিবেদন যে, সম্পাদনায় যদি কোন ভুলভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে ত সে ত্রুটি তাঁরা যেন নিজ গুণে মার্জ্জনা ক'রে নেন। ইতি—

৺মহালয়া, বিনীত

১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৫ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ (ঘটক) গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী

সাধক, পণ্ডিত ও কর্ম্মী মহাপুরুষের জীবন-ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করা অতীব দুরূহ, বিশেষতঃ সকল ঘটনা কাহারও জ্ঞাত নহে। আমার যৎসামান্য যাহা স্মরণ আছে এবং সেই সকল ভাবের যে উদ্দেশ্য বা কারণ, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এই রচনায় তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কারণ, মহাপুরুষদিগের কার্য্যের নানা উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণ লোকের সহসা তাহা বোধগম্য হয় না। সেইজন্য অনেক সময়ে মতদ্বৈধ হইয়া থাকে, ফলে লোক মহাপুরুষদের কার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি প্রথম হইতে বিনীত নিবেদন করিতেছি যে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্যের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধগম্য হইয়াছে, যে সকল ঘটনা আমার স্মরণ আছে এবং বিশ্বস্ত লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, এই গ্রন্থে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিব। অনেক বিষয় আমার না জানার দরুন পরিত্যক্ত হইতে পারে, সেইজন্য আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করার জন্য সকলের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি।

বংশ পরিচয়

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর জীবনী লিখিতে হইলে বংশ-পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিধায় এইস্থানে তাঁহার বংশের বিষয় বর্ণিত হইল। পিতার নাম ৺গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাতা ৺নীলমণি দেবী, রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ, গোত্র বাৎস্য, প্রবর—ঔর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। আদি নিবাস জনাই, পরে খানাকুল কৃষ্ণনগর (ময়াল বন্দিপুর) জিলা হুগলী। জন্ম, শকাব্দ ১৭৮৭, ইংরাজী ১৮৬৫, পৌষ মাস, শনিবার, শুক্লা ষষ্ঠী, সন্ধ্যাবেলা।*

৺গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অল্প বয়সেই কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং ১২৫ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাটীতে অবস্থান করেন। তাঁহার সন্তানাদি কলিকাতাতেই হইয়াছিল। এই বাটী হ্যারিসন রোড প্রস্তুত হইবার সময় রাস্তায় পড়ায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তদবধি চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজ পরিবারবর্গ লইয়া মেডিক্যাল কলেজের সামনে আরপুলি লেনের উপরেই "Imperial Druggists' Hall" বাটীতে বাস করেন।

শরৎ মহারাজ গল্পচ্ছলে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের

---

* ৺গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সন্তানদিগের পর্য্যায়ক্রমে নাম :—কুমুদিনী, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, শরৎ (ইনিই স্বামী সারদানন্দ), চারু, নিতম্বিনী, সতীশ, ভিক্টোরিয়া, আমোদিনী, সুরেশ, নরেশ, প্রকাশ, কেশব, নিরঞ্জন।

গ্রামে পূর্ব্বে খুব দলাদলি ছিল এবং সকলেই পরস্পরের বিরোধী হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধীর ও ভালমানুষ ছিলেন; দলাদলির ভয়ে ও তাড়নায় নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং তদবধি আর কখনও গ্রামে ফিরিয়া যান নাই। কিন্তু গ্রামের লোক আসিলে নিজ বাসায় রাখিয়া আদর যত্ন করিতেন, এই হিসাবেই গ্রামের সঙ্গে যাহা কিছু সম্পর্ক ছিল।

হোসেন খাঁ জিন্নি

শরৎ মহারাজ একদিন গল্প করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় হোসেন খাঁ জিন্নি নামক একজন দিল্লীর পিশাচ-সিদ্ধ মুসলমান আসিয়াছিলেন। তিনি নানারকম ভৌতিক ক্রিয়ার দ্বারা সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন এবং কয়েক বৎসর কলিকাতায় হোসেন খাঁর খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

একদিন হোসেন খাঁ কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া পিশাচ-সিদ্ধির আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইতে লাগিলেন এবং পরে গৃহস্বামীর আঙ্গুল হইতে একটী হীরক অঙ্গুরীয় তুলিয়া লইয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। অঙ্গুরীয়টি হীরার ছিল এবং বেশ দামী। মজলিস ভাঙ্গিয়া যখন সকলে উঠিতেছিল তখন হোসেন আংটিটি ফেরৎ দিবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইলেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অল্পবয়স্ক যুবক। তিনিও হোসেন খাঁর

কৌতুক দেখিবার জন্য বৈঠকখানার এক কোণে বসিয়াছিলেন। বিদেশী যুবক, অতিশয় ভাল মানুষ, ঘরের একপ্রান্তে স্থির হইয়া বসিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। হোসেন খাঁ বালকটির নিরীহ মুখ দেখিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আরে, আংটি কি আমি নিয়াছি! ওই বালকটির পকেটে দেখ তাহা হইলেই পাইবে।" সত্য সত্যই বিদেশী বালকটির পকেট হইতে আংটিটি বাহির হইল। তখন সকলে কৌতুক করিয়া বালকটিকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। তরুণ গিরিশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং লজ্জিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। যুবকটির অপ্রতিভ মুখ দেখিয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন।

গ্রামস্থ লোকের কান্না

শরৎ মহারাজ একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের গ্রাম হইতে একটি লোক কলিকাতা দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। লোকটিকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যত্ন করিয়া তঁাহার বহুবাজারের বাটিতে রাখিলেন। নীচেকার ঘরে ডাক্তারখানা, দরজাতে কাঁচের সার্সী দেওয়া এবং তাহা সকল সময় খুলিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ লোকে ঔষধ লইতে আসিবে। আগন্তুক ব্যক্তি নীচে ডাক্তারখানা ঘরে বসিয়া কাঁচের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অনবরত কাঁদিতে লাগিল, তার কান্না আর ফুরায় না। সকলেই কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি? লোকটা কেবল কাঁদছে কেন?" সে অতি কাতর হইয়া বলিল

যে, রাস্তা দিয়া অত গাড়ী ঘোড়া, ট্রামগাড়ী যাচ্ছে, যদি ছিটকে তাহার গায়ের উপর পড়ে তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গিবে এবং সে মারা যাইবে, এই ভয়েই তাহার কান্না ও শিহরণ। সকলে অনেক করিয়া বুঝাইল যে, ঘোড়ার গাড়ী রাস্তার মাঝখান দিয়া যায়, তারপর ফুটপাত, তারপর বাড়ী ও শেষে ঘর ; এবং ঘোড়ার ট্রামগাড়ী লোহার লাইন দিয়া যায়, এদিক ওদিক দিয়া ছুটিয়া যায় না। কিন্তু বুঝাইলে কি হইবে, তাহার কেবল ভয় হইতে লাগিল যদি ট্রামগাড়ীখানা ঘোড়া সমেত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে তবে তাহার প্রাণটা যাইবে এবং আর দেশে যাওয়া হইবে না। তখন উপস্থিত সকলে ঠিক করিলেন যে, এ লোককে কলিকাতার সদর রাস্তায় কোন ঘরে রাখিলে লোকটা মারা যাইতে পারে বা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইতে পারে। তদনুসারে তাহাকে নিজের গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। লোকটার মাঠের পরিমাণ জ্ঞান ছিল, কিন্তু রাস্তার অল্পপরিসরের জ্ঞান ছিল না, এই জন্য দূরত্বের জ্ঞান না থাকায় লোকটা অত ভীত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই রকমে চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজ গ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেন, ইহা তাহারই উদাহরণ।

'খোরাকী' বংশ

শরৎ মহারাজের বংশ বেশ 'খাইয়ে' বংশ বলিয়া পরিচিত। উঁহাদের বংশের অনেকেই অধিক পরিমাণে আহার করিতে

পারিতেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার যৌবনে অন্য অনেকের অপেক্ষা বেশী আহার করিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) একবার গল্প করিয়াছিলেন, যখন হিমালয় পাহাড়ে স্বামিজী, গঙ্গাধর মহারাজ ও শরৎ মহারাজ ভ্রমণ করিতেন তখন গঙ্গাধর মহারাজ যাহা মাধুকরী করিয়া আনিতেন তাহাতে স্বামিজী ও গঙ্গাধর মহারাজ উভয়ের চলিত কিন্তু শরৎ মহারাজ নিজে বেশী মাধুকরী করিয়া আনিতেন এবং নিজেই তাহা আহার করিতেন। তাঁহার আহারের ক্ষমতা যৌবনের পরেও ছিল। তবে যখন দেহ স্থূল হইয়া পড়ে তখন ক্রমে আহারের ক্ষমতা কমিয়া যায়।

শশী মহারাজের আহার

শশী মহারাজ শরৎ মহারাজের জ্ঞাতি, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রপিতামহ এক এবং তাহা হইতে দুই শাখা হইয়াছিল। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে খুব অনুরাগ ছিল। শশী মহারাজ মুড়ি ও কাঁচা লঙ্কা খাইতে খুব ভালবাসিতেন, এমন কি দেহত্যাগের দুই এক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজ হইতে তিনি যখন বেলুড় মঠে আসিলেন, তখন শশী মহারাজ একদিন প্রাতঃকালে আমাকে বলিলেন, "ওহে, মুড়ি যোগাড় কর দেখি।" আমি তদনুযায়ী একখানা বড় থালাতে রাশিকৃত মুড়ি, ঘি ও নুন মাখাইয়া দিলাম। শশী মহারাজ দুই পা ফাঁক করিয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে

বলিলেন, "ওহে, কিছু কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এস।" ঝাল বেশী দেওয়া উচিত নহে বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছিল; কিন্তু বাধ্য হইয়া ছয়টা-আটটা ঝাল কাঁচা লঙ্কা আনিয়া দিলাম। শশী মহারাজ মহা আহ্লাদিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে মুড়ি লইয়া মুখে দেন ও বাম হস্তে কাঁচা লঙ্কা কামড়ান এবং মহা আনন্দে এক একবার আনন্দধ্বনি করেন। কিন্তু লঙ্কার ঝাল এত বেশী ছিল যে, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি তাহাতেই বালকের মত আনন্দ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "লঙ্কা খেয়ে চোখের জল না পড়লে ঝাল খাওয়াই বৃথা।" শশী মহারাজ অন্ন আহার করিতেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ, অর্থাৎ পরিমাণে দুইজনের ভাতের চেয়েও কিছু অধিক। তিনি বড় বড় গ্রাসে ভাত মুখে তুলিতেন, আর কলাইয়ের ডাল ও লঙ্কা হইলে তাঁহার খুবই আনন্দ হইত। শরৎ মহারাজও খুব লঙ্কার ভক্ত ছিলেন। শশী মহারাজের যক্ষ্মা রোগে দেহ যায়। দেহ যাইবার আট দশ দিন পূর্ব্বে বাগ-বাজারে উদ্বোধনের আফিসের উপরকার ঘরে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখেছ ভাই, শালা ডাক্তাররা আমাকে শুকিয়ে মারছে, আমাকে মাত্র দেড় সের দুধ খেতে দেয়। জান ত আমার বাদসাই গ্রাস, আমি কি করে ভাত খাই।" এই বলিয়া তিনি নিজের আঙ্গুল সকল বিস্তার করিয়া গ্রাসের পরিমাণ দেখাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার খেদোক্তি শুনিয়া গিরিশবাবুকে গিয়া

বলিলাম, যেন তাঁহার আহার্য্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। গিরিশবাবু সকল কথা শুনিয়া বলিলেন যে, যক্ষ্মা রোগীর দেড় সের দুধ যথেষ্ট, তাহার বেশী দেওয়া উচিত নহে। শশী মহারাজের আর বড় বড় গ্রাস করিয়া ভাত খাওয়া হইল না।

পূর্ব্ব পুরুষের গুড় খাওয়ার কথা

শরৎ মহারাজ গল্প বলিতেন যে, তাঁহাদের একজন পূর্ব্ব পুরুষ শীতকালে সকালবেলা হাটে গুড় কিনিতে যান। এক নাগরি গুড় কিনিয়া কাঁধে করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন। পথে গুড়ের নাগরিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, কি করেন, মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি এক বুদ্ধি স্থির করিলেন। দু একটা লোককে বলিলেন, "বাপু, এই গুড়ের কাছে একটু দাঁড়াও যেন কুকুরে মুখ না দেয়।" এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি এক মুদীর দোকানে গিয়া কিছু তেল লইয়া মাখিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আহ্নিক পূজা শেষ করিয়া লইলেন। তাহারপর সেই এক নাগরি গুড় সমস্তটুকু একা আহার করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শরৎ মহারাজ এই গল্পটির সাহায্যে চক্রবর্ত্তী বংশ যে খোরাকী বংশ ইহা প্রমাণ করিতেন।

ঝির কথা

শরৎ মহারাজ ছেলেবেলাকার একটি গল্প বলিতেন। তাঁহাদের বাটীর এক ঝি ছিল। সে সকলকে মানুষ করিয়াছিল।

গরম কাল, রাত্রিকালে সকলে ছাদে শুইয়া আছে। শরৎ মহারাজ ছোট ছেলে, খেয়াল বশতঃ কেবল আঙ্গুল নাড়িতেছেন। ঝি কিছুক্ষণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, "এ কিনা ইংরিজী লেখার আঙ্গুল তাই কেবলই নাড়ছে, কেবলই নাড়ছে। এ ত পাঠশাল বাড়ীর আঙ্গুল নয় যে ঠিক থাকবে!" অর্থাৎ ঝির ধারণা ছিল যে, বাংলা অক্ষর ত্রিকোণা ও নানাভাবে হয় এবং সেইটাই ঠিক লেখা ও তাহাতে আঙ্গুল দুরস্ত হয়। আর, একটা কাগজে যে কোন রকম হিজি বিজি কাটলেই ইংরাজী হয় এবং সেই জন্যই আঙ্গুলটা বেশী নড়ে।

ছাত্র জীবন

শরৎ মহারাজ প্রথমে হেয়ার স্কুলে পড়েন। তাহার পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্টজেভিয়ার কলেজে পড়েন ও তাহারপর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। বাপের ডাক্তারখানা, নিজে ডাক্তার হইলে ভালরূপ চলিতে পারিবে, সেইজন্য তিনি ডাক্তারী পড়িতে গিয়াছিলেন। শীতকালে শব-ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল, বীভৎস মড়ার চেহারা দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন। রাত্রে স্বপনেও ভয় পাইতেন কাজেই ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া দিলেন। ফাদার লাফোঁ (Father Lafont) তখন সেণ্টজেভিয়ার কলেজের সায়েন্সের অধ্যাপক। লাফোঁ দিনের বেলায় কলেজে পড়াইতেন এবং সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার পর বৌবাজারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে 'লাইট' সম্বন্ধে

লেকচার দিতেন। আমিও যখন কলেজে পড়িতাম, বৌবাজারে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে লাইট-এর লেকচার শুনিতে যাইতাম। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে 'ইলেকৃট্রিসিটি'র লেকচার দিতেন। অর্থাৎ, ডাঃ সরকার ও লাফোঁ এই দুইজনেই সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ গিরিশবাবুও কয়েক মাস ডাঃ সরকার ও ফাদার লাফোঁর লেকচার শুনিতে গিয়াছিলেন। কারণ উভয়ের সায়েন্সের লেকচার খুব সুন্দর হইত। শরৎ মহারাজের লাফোঁর উপর অধিক ভক্তি ছিল। লাফোঁ, জেস্যুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। ফ্রান্সে তাঁহার জন্মস্থান। দীর্ঘাকার পুরুষ, সদা হাস্য মুখ। তিনি পূর্ব্বে ইংরাজী জানিতেন না, কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শেখেন এবং ইংরাজীতেই লেকচার দিতেন। লোকটা সায়েন্স নিয়ে এক রকম পাগল হ'য়েছিল। বহির্জগতে মন থাকতো না। শরৎ মহারাজ বলিতেন যে, কলেজের ছুটি হয়ে গেলে লাফোঁ ল্যাবরেটারিতে ঢুকতেন, নানা যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতেন ও মনের আনন্দে কখনও বা শীষ দিতেন, কখনও বা গুন গুন করে গান করতেন। সন্ধ্যা হ'য়ে গেলেও তাঁর কোন হুঁশ হ'তো না। জেস্যুইট কলেজে পড়ার জন্য এবং সন্ন্যাসীদের ভক্তি ও আচরণ দেখিয়া শরৎ মহারাজের যৌবনে খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর খুব অনুরাগ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, জেস্যুইটরা গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের সময়

বা কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাইবার সময় বিশিষ্ট গামলা হইতে পবিত্র জল লইয়া গায়ে ও মাথায় ছিটা দিতেন। হিন্দুদের গঙ্গাজল স্পর্শে পবিত্র হওয়ার ন্যায় তাঁহারাও জল ছিটাইয়া শুদ্ধ হইতেন। তিনি আরও বলিতেন যে, রোমান ক্যাথলিক-দের সহিত হিন্দুদের পূজাপদ্ধতির অধিকাংশ মিল আছে কিন্তু পিউরিটানদের সহিত কিছুমাত্র মিল নাই।

রোমান ক্যাথলিকরা মালা লইয়া "Ave Maria" (আভে মেরিয়া) অর্থাৎ Blessed Mary, এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। শরৎ মহারাজও আলমবাজার মঠে এই রকম সাধনা করিয়া-ছিলেন। অর্থাৎ, একজন জীবন্ত সন্ন্যাসী ফাদার লাফোঁর সহিত তাঁহার মিশিয়া থাকার জন্য রোমান ক্যাথলিকদের ভাবটা তাঁহার ভিতর ঢুকিয়াছিল।

সেন্টজেভিয়ার কলেজে শরৎ মহারাজ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর কাশীপুর বাগানে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে রহিলেন এবং তখনকার মত কলেজে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

ব্যায়াম করা

বর্ত্তমানে যে স্থানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, পূর্ব্বে এই স্থানে একটি পুকুর ছিল। পুকুর ভরাট হইবার পর নব-গোপাল মিত্র বা 'ন্যাশন্যাল মিত্র' সেই জমিতে এক জিম্-ন্যাষ্টিকের আখড়া করেন। যুবক শরৎচন্দ্র সেই আখড়াতে কিছু

দিন ব্যায়াম করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) এই আখড়ায় খেলা করিতেন। কিন্তু সে সময়ে পরস্পরে কোন পরিচয় ছিল না। ব্যায়ামের ডন-বৈঠক কসরৎপ্রথা শরৎ মহারাজের অনেকদিন পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল। জীবনের শেষভাগে একদিন বলরাম বোসের বাটীতে সকালবেলা কথা হইয়াছিল যে, কে কত ডন-বৈঠক করিতে পারে। শরৎ মহারাজ স্থূলকায় ছিলেন কিন্তু এইরূপ স্থূল শরীর লইয়া অনেকক্ষণ ডন বৈঠক করিতে লাগিলেন। আমার কিন্তু জোর করিয়া করায় পরদিন কোমরে ব্যথা হইয়াছিল। জোয়ান বয়সের প্রক্রিয়া শরৎ মহারাজের তখনও স্মরণ ছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত

যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তৈয়ারী হইল এবং সমাজ বেশ জমিয়া গেল তখন শরৎ মহারাজ সর্ব্বদাই সাধারণ-সমাজে যাইতেন। এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব বেশ মুকুলিত হইয়া উঠিল। যদিও নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন কিন্তু তখন উভয়ের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় ছিল না।

শরৎ মহারাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বেশ শ্রদ্ধা করিতেন। বেলুড় মঠে একদিন বসিয়া সাধারণ-সমাজ ও গোস্বামী মহাশয়ের কথা উঠিয়াছিল। শরৎ মহারাজ গোস্বামী মহাশয়ের অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে আনন্দিত হইয়া

বলিলেন, "ওহে, তোমার মনে আছে? গোস্বামী মহাশয় যে বলিতেন, 'হে শ্রীহরি। হে শ্রীহরি!! হে শ্রীহরি!!!' তিন বার তিন প্রকার কণ্ঠস্বর করিয়া উচ্চারণ করিতেন। শব্দটা যেন হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে প্রবেশ করিত।" তাঁহার "হে শ্রীহরি" এই শব্দের উচ্চারণই তাঁহার বক্তৃতার মাধুর্য্য ছিল। তিনি বেদীতে বসিয়া একবার করিয়া উপদেশ দিতেন ও মাঝে মাঝে "হে শ্রীহরি" "হে শ্রীহরি" শব্দ উচ্চারণ করিতেন। এই শব্দের উচ্চারণের জন্যই তাঁহার বক্তৃতা মধুর হইত এবং সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর শরৎ মহারাজের পূর্ব্বে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কেন না শাস্ত্রী মহাশয় তখনকার দিনে অগ্নিময়ী বক্তৃতা করিয়া যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত করিতেন এবং তখনকার দিনে যুবকেরা শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময়ে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি" বলিয়া সংবাদ পত্রে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর শরৎ মহারাজকে বাধ্য হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বরাহনগরের মঠে অনেক দিন পর্য্যন্ত শরৎ মহারাজের মধ্যে ছিল এবং কথায় বার্ত্তায় ব্রাহ্ম সমাজের ভাবই বলিতেন।

স্বামিজীর শরৎ মহারাজের বাটীতে যাওয়া

শরৎ মহারাজ আলমবাজারের মঠে একদিন বলিতে

লাগিলেন,—"ওহে দেখ, নরেন একদিন আমাদের বাড়ী দেখতে গেল, তখনও বাড়ীটা রাস্তায় পড়েনি। সদর দরজায় গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, চোখটা উপর নীচে করতে লাগল; কি যেন একটা অস্পষ্ট মনের কথা যেন স্মৃতিতে আনবার চেষ্টা করলে, তারপর বাড়ীর সব ঘরের কথা ব'লে যেতে লাগল। যতগুলি ঘর ছিল তার প্রত্যেকটির সঠিক বিবরণ ব'লতে লাগল। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে নরেনকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি ত এই প্রথম এসেছ, এসব জানলে কি করে?' নরেন মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—'এটা আমার জানা জায়গা,' আর কিছুই বললে না। তার গম্ভীর মুখ দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও আমার সাহস হ'ল না। কি ক'রে যে সমস্ত বললে আমি তার কিছুই অনুমান ক'রতে পারলাম না। নরেন যে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী তা বুঝতে পারলুম।"

দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া

কলেজে পড়িতে পড়িতে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। বালক, বালকের মতই যাইতেন, অনেকটা হুজুগের জন্য। সেই সময় কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার শীর্ষস্থানীয়। তিনি দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মহাশয়কে দেখিতে যাইতেন এবং তাঁহার বিষয়ে জনসমাজে অনেক কথা প্রচার করিতেন। সেইজন্য অনেক

যুবকেরই পরমহংস মহাশয়কে দেখিবার আগ্রহ হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র এই ভাবেই পরমহংস মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন।

পরমহংস মহাশয়কে নরেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন

যুবক শরৎচন্দ্র যখন স্কুলের ফেরত দক্ষিণেশ্বরে যাইত তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। এই সময়কার নরেন্দ্রনাথের বিষয় পরে শরৎ মহারাজ একটি গল্পে বলিয়াছিলেন।

তিনি নিশ্চয় বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছিলেন সেইজন্য এই গল্পটি কয়েকবার বলিয়াছেন। নরেন্দ্র প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মহাশয়কে দেখিতে যাইল। নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব থেকেই ধারণা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক, কারণ নরেন্দ্রনাথ তখন কলেজে পড়ে ও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করে। পরমহংস মহাশয় কালী দুর্গা মানে, মাঝে মাঝে ভিরমি যায় এবং অনেক সময় তার পরিধেয় বসন ঠিক থাকে না। যাহা হউক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকের কথা অনুযায়ী দেখিতে যাইল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখে যে, একজন লোক বসিয়া আছে, কোমরের কাপড় ঠিক নাই। নরেন্দ্রনাথ যুবক, পরমহংস মহাশয়ের কোমরের কাপড় ঠিক না থাকায় মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। তারপর পরমহংস মহাশয় জোড় হাত করিয়া যুবক নরেন্দ্র-নাথের প্রতি স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,

—"আমি একলাটি রয়েছি, তোমার প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে আছি, তোমাকে দেখবার জন্য আমি বড় লালায়িত। তুমি সপ্তর্ষি-মণ্ডলে ব'সে ধ্যান ক'রছিলে, আমি আসবার সময় সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাত জন ঋষিকে অনেক অনুনয় ক'রতে লাগলুম যেন একজন আমার সঙ্গে আসে। তুজনে মহাধ্যানে সমাধিস্থ হ'য়ে আছে, কেউ কিছু জবাব দিলে না। অবশেষে একজন একটু ইচ্ছা প্রকাশ ক'রল যে, তার খানিকটা অংশ পৃথিবীতে আসবে। সেইজন্মে একটা জ্যোতি পৃথিবীতে এসে পড়ল; তুমি সেই ঋষি।" যে একজন ঋষি পৃথিবীতে আসিবেন বলিয়াছিলেন, প্রথম দর্শনে পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথের ভিতর সেই ঋষির রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন। সপ্তর্ষি মণ্ডল অর্থে, সাতজন ঋষি মহাব্যোমে ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। পরমহংস মহাশয় এইরূপ অনেক কাকুতি মিনতি ও স্তব করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ মনে করিল, এ লোকটা পাগল, এ লোকটা বলে কি? এ আমায় জোড় হাতে স্তব করে কেন? তারপর পরমহংস মহাশয় একটু একটু ক'রে নরেন্দ্রনাথের দিকে এগুতে লাগলেন। তখন তাঁর পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথের ঠিক ধারণা হ'লো এটা পাগল, কাছে ঘেঁসে আসছে কেন? হয়ত পাগলটা কামড়ে দেবে। নরেন্দ্রনাথও নিজের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একটু একটু পিছনে হাঁটিতে লাগিল, যাতে কোরে পাগলটা ধরবার বা কামড়াবার আগেই দরজা দিয়ে পাল্যাতে

পারে। এমন সময় পরমহংস মহাশয় কাছে এসে হাত বা পা দিয়ে ছুঁয়ে ফেললেন। নরেন্দ্রনাথ বিভোর হইয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িলেন কিন্তু তখনও নিজের জ্ঞান আছে, মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি কর, কি কর, আমায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ? আমার বাপ মা আছে, আমি উকীল হবো, টাকা রোজগার করবো।" এইরূপ প্রথম কয়েকবার চীৎকার করিয়া নরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া গেল। পরমহংসদেব কাছে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। খানিক পরে নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; সে প্রকৃতিস্থ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। শরৎ মহারাজ এই গল্পটি অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে বলিতেন। এই হ'লো পরমহংস মহাশয়ের ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য আদেশ

দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মহাশয় শরৎচন্দ্রকে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রনাথ কায়েতের ছেলে, বাপ উকীল, বাড়ী সিমলে। তার কাছে গিয়ে দেখা ক'রবে।" তদনুযায়ী শরৎ মহারাজ ৩নং গৌর মোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেখা করিতে আসেন।

বর্ত্তমান লেখকের সহিত প্রথম পরিচয়

১৮৮৫ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে বেলা ২টা বা ২৷৷০ টার সময় কলেজের ফেরত বই হাতে ক'রে দুটি যুবক নরেন্দ্রনাথের

খোঁজে ৩নং গৌর মোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথের পিতার তখন মৃত্যু হইয়াছে, অবস্থা অসচ্ছল। বাড়ীর পূর্ব্বের অবস্থার চিহ্ন এখন আর কিছুই নাই, কেবল একখানি ভাঙ্গা তক্তপোষ, একটা মাতুর ভাঁজ করা, ঘরের পশ্চিম দিকের তক্তপোষের উপর তুলা বেরকরা একটা গদি, ছু' একটা ছেঁড়া বালিশ আর পশ্চিম দিকে একটা কালো মশারি পেরেকের উপর গুটান; কড়িকাঠ হইতে একটা টানা পাখার ছেঁড়া ঝালর ঝুলিতেছে। নরেন্দ্রনাথের অবস্থা সহসা বিপর্য্যস্ত হওয়ায় তিনি বড় বিভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার শিরঃপীড়া হইয়াছিল, নাকে কর্পূরের নাশ দিতেন, এবং একটা ঘরে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন। যুবক ছুটি বারংবার 'নরেন বাবু আছেন, নরেন বাবু আছেন' বলায় বর্ত্তমান লেখক দরজায় ধাক্কা দিয়া নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া দিল এবং যুবক ছুটি ঘরে প্রবেশ করিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে একটি স্থূলকায়, বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ; গায়ে লংক্লথের ঢিলে-কোট জামা, কাপড় বেশ ফরসা, হাতে বই। অপরটি কৃশ, ফ্যাকাশে ফরসা, একটু একটু দাড়ি হ'য়েছে এবং সঙ্গীটির চেয়ে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ; পরিধেয় বস্ত্র-খানি আধ-ময়লা, গায়ে একটা কোরা কাপড়ের পিরান—অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে বুক পর্য্যন্ত কাটা, তাহাতে তিনটি সুতার বোতাম আর হাতাটি মালাই-কপ আস্তেন, একখানা চাদর লম্বাভাবে দোভাঁজ ক'রে কাঁধে ফেলা। জামার হাতার বোতাম নাই, আর আস্তেন ছুটা উল্টে কনুই পর্য্যন্ত ঝুলছে ; বুকের বোতাম

বন্ধ না থাকায় বুকটা ফাঁক। জামাটা কোমর পর্য্যন্ত, মাথায় চুল উস্কো খুস্কো; চেহারা দেখিলে কলিকাতার ছেলে বলিয়া বোধ হয় না। স্থূলকায় যুবকটিকে দেখিলে বোধ হয় নবাগত কলিকাতাবাসী, কারণ তেমন চট্‌পটে নয়। হাতের আস্তেন-খোলা যুবকটি ঘরের তক্তপোষের উপর পায়চারি করিতেছে ও টানাপাখার দড়িটা লইয়া এদিক ওদিক ঘুরাইতেছে, মাথা নাড়িতেছে, হাত দোলাইতেছে ও অনবরত কথা বলিতেছে; নরেন্দ্রনাথ নিজের গদি ও তক্তপোষের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে এবং স্থূলাকার যুবক দেওয়ালে ঠেস দিয়া আছে। ইহারা দুইজনে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই, এইজন্য প্রথম অবস্থায় দুইজনের নাম যুক্ত করিয়া ডাকা হইত শরৎ-শশী।

দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎ

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে একটা রবিবারে অতি প্রত্যূষে বর্ত্তমান লেখক ঘুরিতে ঘুরিতে কাশীপুরের বাগানের দিকে চলিলেন। চিৎপুরের বাজার ও পল্লী পার হইয়া শরৎ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কিছু চৈ (এক প্রকার ঝাল শিকড়) দিয়াছিলেন; শরৎ মহারাজ সেইগুলিই নরেন্দ্রনাথের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে, বর্ত্তমান লেখকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাতের অন্তিমসময় বলায়, উভয়েই

পুনরায় কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া যাইলেন। নীচেকার হলঘরে সকলে বসিয়া আছেন ; সকাল হইয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে। গঙ্গাধর মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে পুকুরের পাড় দেখাইয়া মুখ ধুয়াইয়া আনিলেন। 'হুট্‌কো গোপাল' গেরুয়া পরিয়াছেন—তিনি বড় কেটলি করিয়া চা করিয়া আনিলেন। শশী মহারাজ ফাগুর দোকান থেকে লুচি, গুট্‌কে কচুরি ও আলু চচ্চড়ি আনিলেন। সকলে কিছু কিছু খাইয়া কলিকাতার দিকে আসিলেন। সেদিন যেন ঘরটি গম্ গম্ করিতেছিল। প্রত্যেক জিনিষই যেন দেবভাবে পরিপূর্ণ। লাটু মহারাজ ঘরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তর্ক করিতেছিলেন। কথাটা হইতেছিল, "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"।

নরেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা

গৌর মোহন মুখোপাধ্যায়ের গলির বাটীতে প্রথম দিন আসা হইতে, যুবক শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে প্রায়ই আসিতে লাগিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র তখন থার্ড ইয়ার ক্লাসে পড়েন ; নরেন্দ্র নাথ বি, এ পাশ করিয়াছেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হওয়ায় সংসারে খুব কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিষন্ন ভাবে থাকিতেন। কঠিন শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছেন এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য কর্পূরের নাশ লইতেন। অনেক সময় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান

করিতেন। যুবক শরৎচন্দ্র ও যুবক শশী কলেজ হইতে ফিরিবার পথে অনেক সময় আসিতেন ও নরেন্দ্রনাথের সহিত য়ুরোপীয় দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত।

তখনকার কথায় এত জোর ছিল যে, শরৎ মহারাজ সমস্ত জীবনে সে কথাগুলি মনে রাখিয়াছিলেন এবং জীবনের অনেক সময় সেই সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। এইরূপ যাতায়াতে নরেন্দ্রনাথের সহিত যুবক শরৎচন্দ্র ও শশীর প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা হইল এবং নিতান্ত আপনার লোক হইয়া গেল। যুবক শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরেও যাইতেন।

কাশীপুরের বাগান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যখন পীড়া হইল, দক্ষিণেশ্বর হইতে তাঁহাকে প্রথম শ্যামপুকুরের একখানি বাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে আনা হইল এবং সেখান হইতে কাশীপুরের মতিঝিলের সম্মুখে বাগান-বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। যুবক শশী ও শরৎ ভ্রাতৃদ্বয় কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করায় ও তাঁর শেষ সময়কার উপদেশ শুনায় ও নরেন্দ্রনাথের সহিত জ্ঞান-চর্চ্চা করায় শরৎচন্দ্রের জীবনের স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। তিনি ঠিক পথ দেখিতে পাইলেন এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু পাইলেন। কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রনাথের কাছে থাকায় সব সময়ে বেদান্ত, দর্শন ও নানা বিষয়ের চর্চ্চা শুনিতে লাগিলেন, এবং

গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রমের স্থান যে উচ্চ তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজের ভাব কিছু ছিল এবং খৃষ্টানী কলেজে পড়ার দরুন বাইবেল প্রভৃতি খৃষ্টান গ্রন্থ পড়া ছিল, এবং বাইবেলে লিখিত যীশুর আদর্শ ও কথোপকথন উভয়েরই বেশ জানা ছিল। নরেন্দ্রনাথ বাইবেল হইতে যীশু ও নিকোডিমাস-এর কথোপ-কথন তুলিয়া বলিতেন, "Thou shalt be born again"; এবং বলিতেন, "Sell that thou hast, and give it to the poor and follow me" অর্থাৎ রক্ত মাংসের দেহেতে যে জীব জন্মায় সে জড়, বদ্ধ জীবই থাকে আর ব্রহ্মজ্ঞানে যে পুনর্জ্জন্ম হয় সেই জন্মই সার্থক জন্ম হয়। দ্বিতীয় কথাটি হইতেছে, "যাহা কিছু তোমার আছে তাহা বিক্রয় করিয়া গরীব দুঃখীকে দান কর এবং এক কম্বল-মাত্র সম্বল করিয়া আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমার ভগবৎ-সাক্ষাৎ হইবে।" বাইবেলের এই কথা দুইটি শরৎচন্দ্রের খুব প্রাণে লাগিয়াছিল এবং প্রায়ই এই কথা দুইটি আবৃত্তি করিতেন। যীশুর আদর্শ লইয়া, অর্থাৎ অসীম ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে লাগিলেন। যীশুর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও প্রতি-জীবের প্রতি ভালবাসা, এই সকল আদর্শ ও ভাব বাইবেলে যেরূপ পড়িতেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিতরও সেই সকল ভাব প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্তভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের হিন্দু শাস্ত্র কিছুমাত্র পড়া ছিল না।

বাইবেল ভাল রকম জানা ছিল, এইজন্য বাইবেলের আদর্শে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে লাগিলেন এবং সংসার আশ্রম হইতে যে, সন্ন্যাস আশ্রম শ্রেষ্ঠ এই ভাবটি তাঁহার ভিতর হইতে বেশ জাগিয়া উঠিল। এই সময়ে জপ, ধ্যান, শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতেন ও নরেন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তাগুলি নিবিষ্টভাবে শুনিতেন এবং নিজমনে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেন। স্কুলের ছাত্র শরৎ আর রহিল না; সদাই বিষণ্ণ ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল ও অতি দীন হীন বালক হইয়া গেল। কথাবার্ত্তা অতি মিষ্ট ও দীনভাবে বলিতে লাগিলেন; যেন দিশেহারা পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, কারণ প্রথম অনুরাগে মহান্ আদর্শ চোখে দেখিতে লাগিলেন অথচ নিজে কিছু করেন নাই ও পথ জানেন না এইজন্য মনটা অতিশয় নম্র ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। যুবকবৃন্দেরা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণদেবের মহান্ আদর্শ লইয়া জীবন কাটাইবে. কি পুনরায় নিজেদের বাটী ফিরিয়া যাইবে, এরূপ সন্দেহ হওয়ায় সকলে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। ঐ শোকার্ত্ত সময়ে চা খাওয়া সম্বন্ধে শরৎ মহারাজ একটি গল্প বলিতেন, "ওহে, শিবরাত্রির উপোস ক'রে, আমাদের চা খেতে কোন দোষ নেই। কেন জান? যেদিন তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) দেহত্যাগ হয়

সকলেই বিষণ্ণ, খাওয়া-দাওয়া কিছুই হইল না। কেই বা উনোন জ্বালে, আর কেই বা রান্না করে? অবশেষে দরমা জ্বালিয়ে কেটলি ক'রে জল গরম ক'রে চা করা হল আর ঢক্ ঢক্ ক'রে খাওয়া গেল। অমন শোকের দেহত্যাগের দিনেও চা খেয়েছিলুম ত শিবরাত্রির সামান্য উপোস ক'রে চা কেন খাওয়া চলবে না বল?"

দোমনা ভাব

কাশীপুরের বাগানে বাস করা উঠিয়া যাইল। বরাহনগরে প্রামাণিকের ঘাটে মুন্সীদের ভাঙ্গা পুরানো বাটী ভাড়া করা হইল। সেখানে শুধু বুড়ো গোপাল ও তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) এই দুইজনের থাকিবার মত বন্দোবস্ত হইল। আর সকলেই যে যাহার বাটীতে চলিয়া যাইল। নরেন্দ্রনাথ ৭নং রামতনু বোসের লেনের বাটীতে আসিয়া পুনরায় আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। শরৎচন্দ্রও নিজেদের বাটীতে গিয়া কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। এই সময়ে ছুটকো গোপাল সকলের বাটী যাইয়া পুনরায় সকলকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ রামতনু বসু লেনের বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার আইনের পুস্তক খুলিলেন। পরীক্ষার অল্পদিন বাকী আছে, পাছে কেহ আসিয়া বিরক্ত করে এইজন্য দরজা বন্ধ করিলেন। কিন্তু বই খুলিয়া অনেক সময় উন্মনা হইয়া থাকিতেন—শূন্য-দৃষ্টি, স্থিরনেত্র! একদিন বেলা প্রায় ৩টার

সময় ছুট্‌কো গোপাল আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ভিতর হইতে উত্তর করিলেন না। শেষকালে গোপাল বলিল, "ভাই, তোকে একটু তামাক সেজে খাওয়াতে এসেছি, দোরটা খোলনা।" নরেন্দ্রনাথ বড় তামাকপ্রিয় ছিলেন, তামাকের নাম শুনিয়া দরজা খুলিলেন। গোপাল গৃহে প্রবেশ করিয়া একথা ওকথার পর কাশীপুর বাগানের কথা তুলিল। সেদিন নরেন্দ্রনাথের পুস্তকও বন্ধ হইয়া গেল এবং দুজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। গোপাল বলিল, "শরৎ এবং শশী বাড়ীতেই আছে, সদরের দিক দিয়া গেলে শরতের বাপ টের পাবে, জানালার দিক দিয়া গিয়া ডাকিলে টের পাবে না।" শরৎচন্দ্র বাটীতে ছিলেন, জানালা দিয়া চাদর ও জুতা ফেলিয়া দিলেন, গোপাল তুলিয়া লইলেন এবং রাস্তায় যেন কোন কাজে যাইতেছেন এইভাব দেখাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তিন জনে একত্র হইলেন। তিনজন একত্রে কখনও মাষ্টার মহাশয়ের বাটী, কখনও গিরিশবাবুর বাটী, কখনও বা বলরাম বোসের বাটী যাইতেন।

এইরূপে প্রায় দুই-তিন মাস কাটিয়া গেল। বরাহনগরের মঠে থাকিবার একটা স্থান হইয়াছে, কিন্তু আহারের অভাব। অবশেষে শরৎচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া বরাহনগরের মঠে যাইয়া রহিলেন। যুবক শশীও সেখানে উপস্থিত হইল। ক্রমে একটি একটি করিয়া জনকতক যুবক একত্রিত হইল। তাহারা স্থির করিল, যদি গৃহত্যাগই করিলাম তবে পরের প্রদত্ত অন্ন

আর কেন খাইব! গৃহত্যাগী, গৃহত্যাগীর পন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। সকলেই স্থির করিল যে, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া আনিবে ও সেই ভিক্ষায় খাইয়া সাধন ভজন করিবে। কাহারও প্রদত্ত জিনিষ গ্রহণ করিবে না বা কাহারও গলগ্রহ হইবে না। যোগেন মহারাজের মুষ্টিভিক্ষার কথা অপর গ্রন্থে * দেওয়া আছে। শরৎ মহারাজ এক একদিন মুষ্টিভিক্ষা করিতে যাইতেন এবং তাঁহারও কোনদিন বিপত্তি ও লাঞ্ছনা হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক স্মরণ নাই। এইরূপে কলেজে-পড়া ছেলেরা মুষ্টিভিক্ষা করিয়া, সেই অন্ন রাঁধিয়া খাইয়া বরাহনগর মঠে প্রাণপণে সাধন ভজন করিতে লাগিল। ভিক্ষাতে নানা রকম চাল পাইত, সেই সব রকমের চাল একত্র করিয়া সিদ্ধ করিত এবং নুন ও লঙ্কা একটা পাত্রে সিদ্ধ করিয়া একটা বাটিতে ঢালিয়া লইত। ভাতগুলো একটা কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর ঢালিত এবং বাটি কারয়া নুন লঙ্কার জলটা মাঝে রাখিত। এক এক বার ভাত মুখে দিত ও এক একবার নুন লঙ্কার জলটা একটু মুখে দিত। জিবে খুব ঝাল লাগিলে ভাতগুলো গলায় নামিয়া যাইত। জল খাবার জন্য একটা হিন্দুস্থানী ধরণের লোটা ছিল, সেটাতে সকলেই জল খেত। ভিন্ন ভিন্ন থালা বা বাটি তখন কিছুই ছিল না। ঐ ঘটিটা অদ্যাপি বেলুড় মঠের ভাঁড়ার ঘরে তোলা আছে। ঘটিটা ফুটা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে বরাহনগরের মঠ প্রথম স্থাপিত হইল।

* স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী।

রাত্রিতে শুইবার কোন বিছানা ছিল না। খান দুই তিন বালান্দার চাটাই, অর্থাৎ মোটা হোগলার মত চাটাই বড় বড় ঘরেতে পাতা ছিল আর একখানা ছেঁড়া সতরঞ্চি ছিল। সতরঞ্চির টানা আছে ত পড়েন নেই, পড়েন আছে ত টানা নেই। এই হ'লো দিনে বসিবার ও রাত্রে শুইবার স্থান। সকলে হাত মাথায় দিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইত, বালিশের অভাব হইলে চাটাইয়ের নীচে এক একখানা ইট দিত তাহা হইলেই বালিশের অভাব পূরণ হইত। কয়েকমাস পরে মশার কামড় অসহ্য হইল, এইজন্য দুই একটা মশারি হইয়াছিল। শীতকালে যখন রাত্রে অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হইত তখন গুড়িশুড়ি মারিয়া শুইয়া থাকিত, কখনও বা উঠিয়া খানিকক্ষণ কুস্তি লড়িয়া লইত, তাহাতে গা গরম হইয়া যাইলে বাকী রাত্রিটা কাটিয়া যাইত। এই ত হইল খাওয়া থাকার বিষয়। তখন গেরুয়া কাপড় পরার প্রথা ছিল না, সকলেই সাদা কাপড় পরিত, কখনও বা কোঁচার কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া রাখিত। জুতাও ছিল না, জামাও ছিল না।

নরেন্দ্রনাথ সকালে ধ্যান ভজনের পর নানারূপ শাস্ত্র লইয়া পাঠ করিতেন এবং সকলে নিবিষ্ট মনে সেই পাঠ শ্রবণ করিত। এইরূপে অনেক শাস্ত্র সেই সময়ে পঠিত হইয়াছিল। জপধ্যান অনেক সময় চলিত। আহারের জিনিষ বা পরিধেয় জিনিষ কোনও গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হইত না। প্রথম প্রথম রাঁধিবার জন্য কোন পাচক ছিল না। নিজেরাই রাঁধিয়া

লইত। রাত্রিতে নিজেরাই খানকতক রুটি করিয়া লইত। কেহ কেহ বা রাত্রে খাওয়া ছাড়িয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্য তখন খানকতক রুটি ও একটু সুজির পায়স ও একটু তরকারি করা হইত। লুচির কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরে পূজা করিতেন, তখন কোন মন্ত্র ছিল না। শশী মহারাজের এক মন্ত্র ছিল, "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব।" এই মন্ত্রেই পূজা ও আরতি করিতেন এবং বড়ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলি খৃষ্টীয় মহাপুরুষের ছবি ছিল, সেইগুলিতে আরতি করিয়া প্রণাম করিতেন। শশী মহারাজ "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" মন্ত্রটি এমন গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করিতেন যে, সমস্ত বাড়ীটা গম্‌গম্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিত! বাকী সকলে যে যেখানে পারিত বসিয়া অনবরত জপ করিত। জপধ্যানই তখন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দিনের বেলায় খাইবার সময় কখনও কখনও তেলাকুচোর চচ্চড়ি বা ঝোল হইত। সেটা হ'লো একটা বিশেষ খাওয়া। দুটি একটি করিয়া বরাহনগরের মঠে অনেকগুলি ভক্ত আসিয়া জুটিল এবং বেশ একটা সঙ্ঘ হইল। নরেন্দ্রনাথ কখনও সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কখনও হাসি কৌতুক করিতেন এবং কখনও বা উৎসাহপূর্ণ বাণী শুনাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপে সকলে বিমোহিত হইয়া একত্র বাস করিতেন। শরৎ মহারাজ এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া গান করা অভ্যাস করায় সর্ব্বদাই ধমকানি

খাইতেন। শরৎ মহারাজ বাগবাজারের রাখাল হালদার, অর্থাৎ হালদার মহাশয়ের ভাইয়ের কাছে মাস ছয়েক গান শিখিয়াছিলেন। একদিন গরমীকালে বিকালে শরৎ মহারাজ ও আমি বাগবাজারের খোড়ো ঘাটের কাছে বেড়াইতেছিলাম এমন সময় রাখাল হালদার বেড়াইতে আসিলেন। শরৎ মহারাজ তাহাকে বেশ সাদরে প্রণাম করিলেন। রাখাল হালদার বলিতে লাগিলেন, "গান অল্পদিন শিখিয়াছিলে, তাহাতে তেমন কিছু শেখা হয় না, আর কিছুদিন শিখিলে ভাল হ'ত", এইভাবে কথা হইল। যাহা হউক, এই উভয় স্থানেই শরৎ মহারাজ কিছু কিছু গান গাহিতে শিখিয়াছিলেন।

শরৎ মহারাজের পিতার দুঃখ প্রকাশ

যুবক শরৎচন্দ্র যখন বরাহনগরের মঠে আসিয়া যোগ দিল গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। কারণ জ্যেষ্ঠপুত্র উপযুক্ত হইলে সংসারের সকল ভার লইবে এই আশায় তিনি এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু যখন শরৎচন্দ্র ও শশীভূষণ উভয়েই সংসার ত্যাগ করিয়া বরাহনগরের মঠে আসিলেন তখন স্বভাবতঃই তাঁহার মনে দুঃখ হইয়াছিল। বিশেষতঃ শশী মহারাজের পিতা ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ছিলেন। পুত্রটি লেখা পড়া শিখিয়া কৃতবিদ্য হইলে সংসারের অনেক সাহায্য হইবে এই আশায় তিনি বসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আশা সফল হইল না। দুই ভ্রাতাই

প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। শশী মহারাজ প্রথম এলবার্ট কলেজে পড়েন এবং তথা হইতে এল্, এ, পাশ করিয়া মেট্রোপোলিটানে বি, এ, পড়েন এবং বি, এ, পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে কাশীপুরের বাগানে চলিয়া আসেন। বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া আর হইল না। এই সব নানা কারণে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "যত ধর্ম্মের ভার কি আমার ওপর দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িল? ব্যাটা সন্ন্যাসী হইল, ভাইপো সন্ন্যাসী হইল, সংসারটা দেখিবার আর কেহ রহিল না।" এইরূপ ভাবে তিনি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিতেন।

সংসারের টানাটানি

একদিন গরমী কালে, তুপুর বেলা বলরাম বাবুর বড় ঘরটিতে বসিয়া আছি। বেলা একটা আন্দাজ, শরৎ মহারাজ আসিলেন, মুখ বড় বিষণ্ণ। একটু জিরিয়ে সান্যাল মহাশয়কে বলিলেন, "সান্যাল, আজ বাড়ী গিয়েছিলুম, মহা দুঃখ কষ্ট দেখে এলুম। ছোট ছোট ভাইগুলো সকাল থেকে চুপ ক'রে বসে আছে। বুড়ো বাপ মা মুখ বিষন্ন ক'রে বসে আছে। ঘরে কিছুই নেই, সকালে উনোন জ্বলেনি। বেলা ১১টার সময় এক শিশি ঔষধ বিক্রয় হ'লো তাইতে বারো আনা পয়সা পেয়ে বাজার হাট কল্লে। ছোট ছোট ভাইগুলোর বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার প্রাণটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তাদের কি কষ্টই হচ্ছে!" শরৎ মহারাজ এইরূপে শোক প্রকাশ করিয়া তখন অনেক কথা বলিলেন।

পিতার অসুখ

এই সময়ে শরৎ মহারাজের পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উৎকট পীড়া হইল। হঠাৎ তাঁহার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। স্যাণ্ডার্স নামক (R. Sanders) মেডিকেল কলেজের ডাক্তার আসিয়া প্রথম দিন শলা দিল কিন্তু শলা ঠিক মাপের না হওয়ায় অনবরত রক্ত বাহির হইতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন নম্বর মত শলা দেওয়ায় প্রস্রাব হইল। সেই সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অবস্থা যায় যায় হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ কাতর হইয়া বাড়ীতে যাইয়া যথাসাধ্য শুশ্রূষা ও ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বলরামবাবু সকালে একবার করিয়া যাইয়া সমস্ত খবর লইয়া সকলকে বলিয়া যাইতেন। এই সময় সকলে বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; শরৎ মহারাজও বিশেষ কাতর হইয়াছিলেন। রোগের একটু উপশম হইলে সকলে সুস্থ হইল এবং শরৎ মহারাজও পুনরায় বাড়ী হইতে আসিয়া মঠে রহিলেন।

ছোট মুখুয্যের শ্লেষবাক্য

গৌরমোহন মুখার্জ্জির গলিতে একঘর মুখুয্যে বাস করিত। তাহারা পাঁচ ভাই, তাহাদের মধ্যে ছোট ভাই শরৎ মহারাজের ভগ্নীপতি; এবং নরেন্দ্রনাথের বাটীর সুমুখেই তাহাদের বাড়ী ছিল। ছোট মুখুয্যে, অর্থাৎ শরৎ মহারাজের ভগ্নীপতি নরেন্দ্রনাথকে উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "বিশু দত্তের 'ত্রিপণ্ড'

ব্যাটাটা আমার শালাটাকে নষ্ট করলে। দক্ষিণেশ্বরে কে একটা "Great Goose" (পরমহংস) হয়েছে, সেইটার কাছে গিয়ে গিয়ে সব পণ্ড করলে।" এস্থলে ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বরাহনগরের মঠ স্থাপিত হইলে যত লোকের ভর্ৎসনা ও গালি নরেন্দ্রনাথের উপরই বর্ষিত হইয়াছিল। কারণ অনেকেই বলিত, "ডেঁপো নরেন ছোঁড়াটা "Great Goose" (পরমহংসদেব) এর কাছে গিয়ে নিজে বখে গেল আর যত রাজ্যের ছেলেকে বখাচ্ছে।"

ঠাকুর ও ৺মা কালীর নিকট নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা

শরৎ মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের সংসারে তখন ভারি কষ্ট। সহসা পিতৃবিয়োগ হওয়ায় খুব অনটনে পড়েন, এমন কি দৈনিক আহার্য্যটা পাওয়াও কষ্টকর হইল। নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মহাশয়ের কাছে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন যে, আপনি বলুন আমার যেন কিছু টাকা হয়। পরমহংস মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যা, মা কালীর পা ছুঁয়ে যা চাইবি তাই পাবি।" নরেন্দ্রনাথ এই আশ্বাস পাইয়া পরমহংস মহাশয়ের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং ভিতর দিকের বারান্দার মধ্য দিয়া উঠানে আসিলেন, তখনও মনে আছে যে, মা কালীর কাছে টাকা চাহিব সেইজন্য যাইতেছি। কিন্তু উঠানের অর্দ্ধেক আসিয়াই সব ভুলিয়া গেলেন, অন্যমনস্ক

হইয়া মা কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং মা কালীর পা ছুঁইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও, আমায় আর যেন কোন জিনিষ ছুঁইতে না পারে।" এইরূপ অনেকক্ষণ ধ্যান ও কাতরোক্তি করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলেন ও উঠানের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতে লাগিলেন। অৰ্দ্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পুনরায় মনে পড়িল আমি যে টাকা চাহিব বলিয়া গিয়াছিলাম, তা বলতে পারলুম না কেন? এইজন্য রাগ করিয়া পরমহংস মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কেন আমি টাকা চাইতে পারলুম না? আমি এক চাইতে অন্য চাইলুম কেন? তুমি আমায় কি করলে যে, আমি টাকা চাইতে পারলুম না?" পরমহংস মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "তা আমি কি করব। তোর মুখ দিয়ে টাকার কথা বেরুল না, তুই নিজেই বলতে পারলি না।" নরেন্দ্রনাথ এক কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার কি করলে" ইত্যাদি। পরমহংস মহাশয় হাসতে হাসতে বললেন, "ওরে, ও সব তুচ্ছ জিনিব কি তোর জন্য? ও সব অন্যের জন্য। তোকে অনেক কাজ করতে হবে, তবে বলছি, তোর মা ভায়ের ডাল ভাতটা চ'লে যাবে, তাতে কোন কষ্ট হবে না।" নরেন্দ্রনাথ এইরূপে মা কালীর কাছে টাকা চাহিতে গিয়া টাকার কথা মুখ দিয়া না বাহির হওয়ায় বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু বাড়ীর অবস্থা পূর্ব্বের মতই রহিল।

শরৎ মহারাজ কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যীশু সম্বন্ধে কথা

একদিন গরমী কালে শরৎ মহারাজ ও আমি দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পাশেই যদু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। নদীর ধারে বড় লন'টাতে বেড়াইতেছিলাম। তখন যীশুর বিষয় নানা কথা উঠল। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "পরমহংস মহাশয় ভাবাবেশে যীশুকে দর্শন করিয়াছিলেন। Farrar † ও Cunningham Geikieর গ্রন্থে যীশুর অনেক চেহারার বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে একটি রূপ তিনি ভাবাবেশে দর্শন করিয়াছিলেন।" এইরূপে যীশুর চেহারার বিষয় নানা কথা হইতে লাগিল। যাঁহারা Farrar ও Cunningham Geikieর পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এই বিষয় বুঝিতে পারিবেন। তারপর কথা উঠিল যীশু ও যীশুর শিষ্যদের বিষয়। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "তিনি (পরমহংস মহাশয়) বলিতেন যে, ভাবাবেশে অনেক সিদ্ধ পাদরীদের (Padre) উপদেশ শ্রবণ করিতেন, অর্থাৎ সমাধি অবস্থায়, বিশিষ্ট সিদ্ধ খৃষ্টীয় যাজক ধর্ম্ম বিষয়ে কি উপদেশ দিতেছেন তিনি তাহা যেন সমস্ত শুনিতে পাইতেন।" ইহাকে বলে 'দূরাৎ দর্শনম্ দূরাৎ শ্রবণম্'। এই অবস্থা সিদ্ধ মহাপুরুষদের হইয়া থাকে। সেইদিন যদু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে পরমহংস মহাশয় যীশু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অনেক কথা শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন।

---

† Frederick William Farrer.

সন্ন্যাস গ্রহণ

বরাহনগরের মঠে বেলতলায়, উপস্থিত সকলেই বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, কেবল যাঁহারা তখন বাহিরে ছিলেন তাঁহারাই বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। পরে তাঁহারাও বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শরৎ ও শশী মহারাজের নরেন্দ্রনাথের আনুগত্য

বরাহনগরের মঠে প্রথম অবস্থাতে নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাটীর মকদ্দমা আরম্ভ হইল; টাকার অভাব, পাইবারও উপায় নাই। সংসারের অবস্থাও খুব অসচ্ছল। মকদ্দমা চালাইতে হইবে। আবার ঘোর বৈরাগ্যসাধনাও করিতে হইবে এবং গুরু-ভাইদিগকে একত্র রাখিয়া সন্ন্যাসীর কঠোর পথ দেখাইতে হইবে, এই উভয় সঙ্কটে নরেন্দ্রনাথকে কিছুদিন শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তেজস্বী ও বীর পুরুষ না হইলে দুইটি বিপরীত ভাব একত্র রাখিয়া নিজেকে নিরাপদ রাখিতে পারে না। মকদ্দমা চালাইবার টাকার এত অনটন যে, একদিন শশী ও শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ ভাই নরেন, তোমার টাকার অনটন, মকদ্দমার খরচ বেশী; আমরা কেন দুজনে গিয়ে বালির স্কুলে মাষ্টারী করি না? কিছু কিছু রোজগার করি আর মঠে আসিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই টাকা হইতে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে।" নরেন্দ্রনাথ এই অমানুষিক ভালবাসা

দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ওরে শরৎ, ওরে শশী, তোরা করিস কি? আমার জন্য যে তোরা প্রাণত্যাগ কর্ত্তে পারিস তা আমি জানি। ওসব কর্ত্তে হবে না।" এই বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। নিঃস্বার্থ ভালবাসা কাহাকে বলে এবং মহাপুরুষ কি করিয়া হয়, তাহা দেখাইবার জন্য এই গল্পটুকু উল্লেখ করা হইল।

শরৎ মহারাজ কথিত লাটুর ধ্যানের কথা

একদিন আমি বরাহনগরে বিকাল বেলা গিয়াছি। শরৎ মহারাজ একটু অভিমান করিয়া বলিলেন, "দেখ হে, লেটো শালা সবচেয়ে উঁচিয়ে যাচ্ছে আর আমরা সব পিছনে পড়ে রইলুম। আমরা ভদ্রলোকের ঘরের কলেজেপড়া ছেলে পিছনে পড়ে রইলুম, আর ও শালা রামবাবুর চাকর ছিল, দুদিন এসে শালা আমাদের চাইতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটাই আর ও শালা সমস্ত রাত্তিরটা জপ করে। শালা আমাদের ফাঁকি দিয়ে মজা মারে।" আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কি রকম করে?" শরৎ মহারাজ বললেন, "প্রথম রাত্রে লাটু নাক ডাকিয়ে ভাল ক'রে ঘুমোয় আর জপের মালাটি লুকিয়ে রেখে দেয়। সকলে যেমনি ঘুমিয়ে পড়ে তখন লেটো উঠে বসে আর জপ করতে সুরু ক'রে দেয়। আমি একদিন মনে করলুম যে, বোধ হয় ইঁদুর এসেছে তাই খুট্ খুট্ ক'রে আওয়াজ করছে; যেমনি তাড়া দিই আর লেটো মালা ঘুরানো

বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ে আবার কিছু পরে উঠে জপ করে। তুদিন এই রকম দেখে আমার মনে সন্দেহ হ'ল যে, ইঁতুর নয়, লেটো শালা জপ করে। আমিও একদিন ওৎ পেতে মিট্‌কি মেরে ঘুমের ভান ক'রে শুয়ে রইলুম, দেখি না, খানিক রাত্রে লেটো শালা উঠে বসল; তারপর জপ ক'রতে স্বুরু ক'রে দিলে। আমি বল্‌লুম, 'তবে রে শালা! আমাদের ফাঁকি দিবি। আমরা ঘুমে রাত্তিরটা কাটাব আর তুই শালা বসে মজা মারবি? দাঁড়াও ত আমরাও ঐ কাজ কচ্ছি'।"

শরৎ মহারাজের বিরহভাব

শনিবার, বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়িতেছে। বেলা ৪টা, ৪৷৷০টার সময় বাহিরের আম পাতাতে বৃষ্টি পড়িয়া ঝিম ঝিম শব্দ হইতেছে। বড় ঘরটিতে দক্ষিণের দেওয়ালের কাছে তারকদা (শিবানন্দ স্বামী) ও শরৎ মহারাজ অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায়। শরৎ মহারাজ বিষন্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন, তারকদার চোখটা জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "শরৎ, বাঁয়াটা ধর ত হে।" শরৎ মহারাজ পশ্চাদ্দিকের পুস্তকের পার্শ্ব হইতে বাঁয়াটা নামাইলেন। মহাপুরুষের কণ্ঠধ্বনি একে ত অতি মিষ্ট ছিল তদুপরি প্রাণের আবেগে বিষাদভরে মল্লার স্বরে গান ধরিলেন:

"হরি গেল মধুপুরি, হাম কুল বালা,
বিপথ পড়ল সহি মালতি মালা;

নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস,
সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুঃখ মোহি পাশ্।"

গানটি গাহিবার সময় বাণী এরূপ কাতরভাবে ও হৃদয়-বিদারকভাবে নির্গত হইতেছিল যে, রাধিকার কৃষ্ণ অদর্শনে যে বিরহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা যেন চিত্রাকারে চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। দুজনের গাল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতেছে। শরৎ মহারাজ ঠেকা দিতেছেন কিন্তু ভাবে গদগদ। এই বরাহনগরের মঠের প্রত্যেক স্মৃতি অতি পবিত্র ও অতি মধুর। রামকৃষ্ণ মিশন যে শক্তি এখন বিকাশ করিতেছে তাহা কাশীপুর বাগান ও বরাহনগরের মঠে সঞ্চিত হইয়াছিল।

গুপ্ত মহারাজকে যত্ন করা

নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠ হইতে পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। হাত্রাসে গুপ্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অনেকেই গুপ্ত মহারাজের আগমনে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল এবং তাহাকে বরাহনগর মঠে থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে এইরূপ নানা কথা তুলিয়া অনেকেই তাহাকে দূর ছাই করিতে লাগিল। কেহ কেহ দল পাকাইয়া সুরু করিল যে, যাহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে নাই তাহারা মঠে থাকিতে পারিবে না। শুধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সময়কার লোক কয়েকটি কেবলমাত্র থাকিতে পারিবে, অপরে

নয়। দ্বিতীয় কথা, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কি নরেনকে গুরু-গিরি করিবার আদেশ দিয়াছেন ? নরেন কেবল হাম বড়াই ক'রে নিজের মত চালাবার চেষ্টা ক'রছে, তাঁর কথা একেবারেই মানে না। তাঁর মুখের উপরেই তর্ক করতো। ওর কেবল বই পড়া আর শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। জনৈক সন্ন্যাসীর নরেন্দ্র-নাথের প্রতি এই আক্রোশ থাকায় তিনি গুপ্ত মহারাজকে মঠে থাকিতে দিতে একেবারেই অনিচ্ছুক এবং একটা দল পাকাইয়া গুপ্ত মহারাজকে নানারূপ অপ্রিয় কথা বলিতে লাগিলেন। এই সময় শরৎ মহারাজ ও কালী বেদান্তী খুব মহত্ব দেখাইয়া-ছিলেন। উভয়েই গুপ্তের দিকে দাঁড়াইলেন এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি উভয়ের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাহা তখন ফুটিয়া বাহির হইল। এই দুইজনে জিদ করায় গুপ্ত মহারাজ বরাহনগরের মঠে থাকিবার একটু স্থান পাইল। উভয়েই বলিলেন যে, নরেন যখন ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে, অবশ্যই ইহাকে রাখিব, না হয় আমরাও চলিয়া যাইব। এইরূপ জেদ করায় উক্ত সন্ন্যাসীটি কিছুদিন পরে আপনা আপনি ঠাণ্ডা হইলেন। গুপ্ত মহারাজের এই কথাটি আজীবন স্মরণ ছিল। সেই কারণ গুপ্ত মহারাজ আজীবন উক্ত সন্ন্যাসীটির সহিত কখনও ভাল করিয়া কথা কহে নাই। উহাকে দেখিলে গুপ্ত মহারাজ রাগিয়া উঠিত এবং মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে ঐ কথাটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল যে, শরৎ সেই সময় আমাকে আশ্রয় না দিলে আমি আত্মহত্যা করিতাম। যাহা হউক, শরৎ

মহারাজ ও কালী বেদান্তী সেই সময়ে গুপ্ত মহারাজকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই দুই জনের যত্ন না পাইলে গুপ্ত মহারাজ বিশেষ সঙ্কটে পড়িতেন। কারণ তিনি চাকরি ও আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের কাছে থাকিবেন তাঁহারাই তাঁহাকে প্রত্যাখান করিতেছেন। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শরৎ মহারাজ ও কালী বেদান্তী খালি নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসাপ্রযুক্ত গুপ্ত মহারাজকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে ঔষধ আনিয়া দেওয়া

একটি সামান্য কথা বা কার্য্য যদি প্রাণের ভিতর হইতে হইয়া থাকে তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে। এই নিমিত্ত একটি সামান্য ঘটনা এখানে বিবৃত করিলাম। বরাহনগরের মঠের প্রথম সময়েতে নরেন্দ্রনাথের একবার পেটের অসুখ করে। কিছুই পেটে হজম হয় না; অনবরত পেট নামাইতেছে। শরৎ মহারাজের পিতার একটি ডাক্তারখানা ছিল। বহুবাজারে Imperial Druggists' Hall ইহারই পিতার ছিল। পেটের অসুখের পক্ষে ভাল এবং তখন নূতন ঔষধ বলিয়া শরৎ মহারাজ Fellow's Syrup এক শিশি আনিয়া নরেন্দ্রনাথকে রামতনু বসুর বাটীতে দিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন বাটীতে ছিলেন।

পঞ্চবটীতে ধ্যান করা

শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রনাথ ও আমি একবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপধ্যান করিতে-ছিলাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ব্বেই ঐখানে রাত্রিকালে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথায় তখন কেহ বিশেষ মনোযোগ করে নাই। নরেন্দ্রনাথ ও আমি ধুনি জ্বেলে বসে ধ্যান করছি। রাত্রি একটা কি দেড়টা হয়েছে। আমাদের ধ্যানটা বেশ জমে গেছে। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে দেখি যে, নরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে কটমট ক'রে চেয়ে রয়েছে। একি! নরেন এমন বিকট দৃষ্টি ক'রে চেয়ে রয়েছে কেন? মাথাটা কিছু খারাপ হলো নাকি? আমি একটু উদ্বিগ্ন হলুম কিন্তু স্থির হয়ে রইলুম। তারপর দেখলুম নরেন কার উপর রেগেছে এবং সুমুখে কাকে দেখছে আর তার উপর রেগে, খেঁকিয়ে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তখন বুঝলুম অনাহার অনিদ্রা ও সারা দিনরাত জপধ্যান ক'রে নরেনের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু পরে দেখি না নরেন একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'তবে রে শালা!' ব'লে অন্ধকারে যেন কাকে মারতে উঠলো। আমার তখন ঠিক ধারণা হ'লো যে, নরেন ঠিক ক্ষেপে গেছে। আমি ত একটানে দৌড় দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের দিকে পালালুম অথচ নরেনের তখন এ রকম অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। নরেনকে এরকম অবস্থায় একা রেখে যাই কি করে! যাক,

একটু পরে দেখি, নরেন কাঠটা ধুনিতে রেখে স্থির হ'য়ে বসলো। আমাকে কাছে না দেখে ডাকল, 'ও শরৎ, কোথা গেলি? আয় না!' আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে ধুনির কাছে গিয়ে আবার বসলুম। নরেন বললে, 'ভয় ক'রতে হবেনা, সে শালাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। শালা আর ভয় দেখাতে আসবে না।' আমি বললুম 'সে আবার কে?' নরেন বললে, 'আরে, যে শালার কথা উনি বলেছেন, শালা উৎপাত ক'রতে এসেছিল।' তারপর আমরা আবার জপধ্যান ক'রতে বসেছিলুম।"

তপঃশক্তি

বরাহনগরের মঠে এই সময়টা যে শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল তাহাতেই নরেন্দ্রনাথ, শরৎ মহারাজ ও কালী বেদান্তী জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন। কোথায় বা দিন কোথায় বা রাত্রি! যথার্থই সকলেই এই সময়ে ভগবান লাভের জন্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও মহান্ আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য জপ, ধ্যান ও তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। আর, সকলের ভিতর, অর্থাৎ সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর ভিতর এমন একটা ভালবাসা ছিল যাহা বর্ণনাতীত—যেন এক শরীর, এক মন। একজনের গায়ে চিমটি কাটিলে অপর জনে "উহু" করিয়া উঠে। এইরূপ জমাট ভালবাসা কখনও দেখি নাই। যীশুর শিষ্যদিগের ভিতরে, বুদ্ধদেবের শিষ্যদিগের ভিতরে যেরূপ ভালবাসা ছিল তাহার কিছু কিছু পুস্তকে পড়িয়া সামান্য আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম।

কিন্তু এই জমাট ভালবাসা বরাহনগরের মঠে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখনও দু'একজন যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন; তাঁহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি এখনও ফিরিয়া আসিবে।

মূর্ত্তিপূজার কথা

একদিন অপরাহ্নে আমি বরাহনগর মঠে যাই। শরৎ মহারাজ বড় ঘরটিতে একটি বালিশে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন। সম্ভবতঃ তিনি পাহাড় হইতে অল্পদিন ফিরিয়া আসিয়াছেন। কথাগুলি অতি মধুর ও বৈরাগ্য-পূর্ণ এবং সর্ব্ববিষয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি সদা-সর্ব্বদা স্থির এবং মৌনভাবে থাকিতেন। যাহা কিছু বলিতেন তাহা সারগর্ভ, ঈশ্বরের উপর নির্ভরতাপরিপূর্ণ। তিনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে খুব যাতায়াত করিতেন। এইজন্য ব্রাহ্মসমাজের ভাবটা তাঁহার ভিতর প্রবল ছিল। কথা প্রসঙ্গে সাধন প্রণালীর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন যে, বেদান্ত যে নিরাকার বা নির্গুণের কথা বলিতেছে সে ত ঠিক কথা, কিন্তু তা ব'লে বিগ্রহ পূজা ক'রে মুক্তি হবে না কেন? পথ কি একটা গণ্ডীর ভিতর? পথের ঝগড়া ক'রতে গেলে আসল জিনিষ হারিয়ে যায়। এই ত চোখের সামনে তাঁকে দেখলুম, মূর্ত্তি পূজা ক'রে এত উচ্চ অবস্থায় উঠেছিলেন। মূর্ত্তি পূজায় হবে না কেন? সকলের পক্ষে সুবিধা না হ'তে পারে কিন্তু একেবারেই

যে, এটা কিছু নয় এ কথা বলা যেতে পারে না। এইরূপ সাধন বিষয়ের অনেক কথা তিনি বলিয়াছিলেন। এই সময় সর্ব্বদা তিনি এই গানটি গাহিতেন ঃ

"ম্যায় গুলাম্ ম্যায় গুলাম্ ম্যায় গুলাম্ তেরা
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা
দো রোটি এক লেঙ্গোটি তেরা পাশ্ ম্যায় পায়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গায়য়া
তু দেওয়ান্ মেহেরবান নাম তেরা বরেয়া
দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥"

বিল্বমঙ্গলের কথা ও বৈরাগ্যের পর্য্যায়

একদিন শরৎ মহারাজ বেলা ১১টার সময় রামতনু বোসের গলির বাটীতে আসিলেন। তারপর আমরা দুজনে বাগবাজারে গিরিশবাবুর বাড়ীতে যাইলাম। গিরিশবাবু সবেমাত্র আহার করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন; আমরা দুজনে কাছে বসিলাম। বিল্বমঙ্গল নাটক দু' চার বার অভিনয় হইয়াছে, সহরে বড়ই হুলুস্থুল। শরৎ মহারাজ গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বিল্বমঙ্গল ত বৈরাগ্য করিয়া চলিয়া গেল, আবার কেন তাহার নিম্নগতি হইল? একবার বৈরাগ্য হ'লে আবার সংসারের দিকে মন আসে কেমন ক'রে?" গিরিশবাবু তামাক টানিতে টানিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "শরৎ, তোমার বয়স অল্প,

জিনিষটা এখনও ঠিক বুঝ নাই। যেটা প্রথম বৈরাগ্য হয় সেটা সামান্য উত্তেজনায় বা ঝোঁকের মাথায় হইয়া থাকে, ওটা আসল বৈরাগ্য নয়। বিল্বমঙ্গল ছুটো ধমকানি খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, ওটা হচ্ছে কাঁচা বৈরাগ্য। তারপর একটু কষ্টে পড়তেই খেয়ালটা কমে গেল তখন আবার পূর্ব্ব অভ্যাস ও পূর্ব্ব স্মৃতি জোর ক'রে মাথা তুলে উঠল। এই সময় অনেকেই আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসে ও যে যাহার পূর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু তারপর যদি সদ্‌গুরু বা মহতের আশ্রয় পায় তাহা হইলে দ্বিতীয় বার ধাক্কা খায় ও আসল বৈরাগ্য আসে। সেটা স্থায়ী বৈরাগ্য, ঝোঁকের মাথায় নয়; সেটা হচ্চে ঈশ্বর পাবার জন্য গৃহত্যাগ এবং সেজন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রথম বৈরাগ্যটা রাগ বা সংসারের যন্ত্রণায় বৈরাগ্য; ওর সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই। সেজন্য আমি বিল্বমঙ্গলের প্রথমে অনেক হৈ চৈ করার ভাব দেখাইয়াছি, যেন ভাবের উত্তেজনায় তুফান বহিতেছে কিন্তু তারপর যখন একবার ধাক্কা খেয়ে ঈশ্বরানুরাগ এলো তখন সে যেন নীরব, হৈ চৈ করেনা, বেশী বকে না, যেন সে ঈশ্বর লাভের জন্য লালায়িত। তখন হচ্ছে প্রাণের কথা, জিভের কথা নয়। সাধকের জীবন ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে।" আমরা দুজনে গিরিশবাবুর ব্যাখ্যা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম যে, মনুষ্যচরিত গিরিশবাবু কেমন দেখিতে পাইয়াছেন।

গুরুসেবা ও গুরুভাইকে সেবা করা

বরাহনগর মঠে প্রথম অবস্থাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনে হৃদয়ের ভিতর তাঁহার প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল সেটা পরস্পরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। অর্থাৎ পরস্পরের ভিতর একটা ভালবাসা ও টান আসিল। সেই সময়ে গুরু-সেবা ও গুরুভাইকে সেবা করা যে একই, এই ভাবটা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

উপরকার পাইখানাতে পশ্চাতের পুকুর হইতে জল আনিয়া রাখা হইত: গোটা দুই মাটির গামলা ছিল, জল তাহাতেই রাখা হইত। একদিন প্রসঙ্গক্রমে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তিনি (পরমহংসদেব) ষোল আনা কঠোর করিয়াছিলেন, আর আমরা কি তার এক আনাও করিতে পারিব না? পরমহংস মহাশয় অপরের পাইখানা ধুইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁর নাম করিয়া কিছুই করিতে পারিব না?"

নরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি এমন হৃদয়স্পর্শীভাবে বলিয়াছিলেন যে, সকলের ভিতর সেবার ভাব ও কঠোরতা করিবার ইচ্ছা অগ্নিশিখাবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে একদিন কে একজন অন্যের অসাক্ষাতে পাইখানাটি ধুইয়া দিয়া, দুতিনটি হুঁকাতে জল বদলাইয়া, কলিকাতে টিকা তামাক সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া রাখিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সকলে পাইখানায় গিয়া দেখেন যে, পাইখানা পরিষ্কার, তামাক— তৈয়ারী। পাইখানায় মল পতনের জন্য একটি মাত্র ছিদ্র।

একজন শৌচে বসিলে অপর কয়েকজন উবু হইয়া বসিয়া ধূমপান ও বেদান্তাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। পুনরায় আর একজনের বেগ আসিলে তিনি মলত্যাগে বসিলে অপর কয়েকজন ধূমপান ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে এক একজন করিয়া শৌচে বসিতেন ও অপর কয়েকজন শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এইরূপে শৌচ-স্থান বৈঠকখানায় পরিণত হইল। ক্রমে ক্রমে অল্পদিনের ভিতর বিষ্ঠা পরিষ্কার এক মহা সাধনায় পর্য্যসিত হইল। ইহা যেন একটা তপস্যায় পরিণত হইয়া গেল। একজন যদি ভোর থাকিতে পাইখানা সাফ করে ত পরদিন অপর একজন অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া সমস্ত কাজ চুকাইয়া রাখিত। তবে কে যে কবে পাইখানা পরিস্কার করিত তাহা কেহই টের পাইত না। শরৎ মহারাজও অলক্ষিতে এই কাজ করিয়াছিলেন। এই ভাবটা জগতে খুবই বিরল।

ধূলাভস্ম মাখা দেহ

বরাহনগর মঠে সাধক অবস্থায় কি প্রকার কঠোরতা করা হইয়াছিল তাহারই কিঞ্চিৎমাত্র আভাস এখানে প্রদত্ত হইল। আহার ও শয্যার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ বেশভূষা ত দিগম্বর অবস্থা: তাহাতেও হইল না, কখনও কখনও নিকটস্থ শ্মশানে যাইয়া জপ করিতে বসিত। গঙ্গাধর মহারাজ একদিন বলিলেন যে, রাত্রি দশটার সময়

শ্মশানে একটা মড়া পোড়ান হইবে। সকলের খেয়াল হইল যে, শ্মশানে বসিয়া জপ করিতে হইবে। চিতায় আগুন লাগান হইল, শব ভস্ম হইয়া গেল, শববাহীরা যে যার বাটী চলিয়া গেল কিন্তু সন্ন্যাসীবৃন্দ একাগ্র মনে সমস্ত রাত্রি জপ করিতে লাগিল এবং সকাল হইলে গঙ্গায় ডুব দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিল। এই সময় ধূলা কাদা মাখায় গায়ের চামড়া দেখা যাইত না। স্নানকালে গোটাকতক ডুব দেওয়া, গা ঘসা বা মাজা নয়। এইজন্য গায়ে একপুরু ময়লা পড়িয়া গিয়াছিল। ধূলায় পড়িয়া থাকা যেন একপ্রকার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। এই হচ্ছে কঠোর সাধনের কিঞ্চিৎ আভাস।

চা খাওয়ার কথা

নরেন্দ্রনাথের নিজের পিতৃ-ভবনে চা'র খুব প্রচলন ছিল। তাঁহাদের বাটীতে চা তৈয়ারী করিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বাল্যকাল হইতে চা পান করা নরেন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল। বরাহনগর মঠে যখন সকলে একত্রিত হইল তখন সকলেরই যুবা বয়স, ভদ্রলোকের ছেলে, পেটে অন্ন নাই, এই জন্য ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইত। কিন্তু কি করিবে, কাহারও কাছ হইতে কতকটা গুঁড়া চা আনিয়া রাখিয়া দিত। জল গরম করার একটা কেটলি ছিল ও একটা টি-পট আর খান দুয়েক কুসীর মত চামচেও ছিল। গাড়োয়ানরা রাস্তায় যেমন বাটি ক'রে চা খায়, যে বাটিকে খুরি বাটি বলে, সে রকম বাটি ছিল।

বাটিগুলা হাতলওলা বাটি নয়, মুসলমানরা যেমন বাটিতে ডাল ইত্যাদি খায় সেই রকম বাটি। এই বাটিতে কড়া চা ঢালত, তাতে না আছে চিনি না আছে দুধ আর তাই চক্ চক্ ক'রে খেত। আর খানিকটা তামাক ছিল তাই টানত। এক একদিন বৃষ্টি হ'চ্ছে, মুষ্টিভিক্ষা ক'রতে কেউ বেরুল না, ঘরেও কিছু খাবার জিনিষ নেই তখন কি করা যায়, ঘরে চা তৈরী ক'রে তানপুরা হাতে ল'য়ে ভজন গান সুরু হ'ত। এই ভাবে একটা বেলা কেটে যেত, কিন্তু তাতেও সকলে বেশ একটা আনন্দে স্ফূর্ত্তিতে থাকত। একবার শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি এত চা খেতে শিখলে কোথা থেকে?" শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তোমার ভাইয়ের পাল্লায় প'ড়ে। তোমাদের বাড়ীতে যে চায়ের রেওয়াজ ছিল সেইটা বরাহনগরের মঠে ঢুকিয়ে দিলে, আর আমাদের চা-খোর ক'রে তুললে। তোমরা হ'চ্ছ একটা নার্কটিক্ ফ্যামিলি (Narcotic Family)। এইরূপে ক্ষুধার সময় কড়া চা পান করিয়া সকলের লিভার খারাপ হইয়া গেল এবং নানা প্রকার ব্যারাম দেখা দিতে লাগিল।"

গিরিশবাবুর কাছে যাওয়া

শরৎ মহারাজের মনটা এই সময় বড় খারাপ থাকিত। নরেন্দ্র-নাথ সব সময় কাছে না থাকায় কথা-বার্ত্তা কহিবার জন্য শরৎ মহারাজ অনেক সময় গিরিশবাবুর কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতেন।

গিরিশবাবুর অদ্ভুত প্রতিভা। যখন যে কথা উঠিত, সেই সময়ে তাহার গভীর চিন্তাপূর্ণ নানাকথা কহিয়া যাইতেন।

গিরিশবাবুর কাছে বসিয়া শরৎ মহারাজ নানা প্রকার কথা শুনিতেন এবং সেই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তর্ক ও বিচার করিতেন। কখনও বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা, কখনও বা সায়েন্স, ইতিহাস, বাইবেল, এবং কখনও বা বেদান্তের অতি গভীর তত্ত্বের আলোচনা হইত। এই সকল কথা মন দিয়া শুনিবার বস্তু ছিল। এই সকল কথা মনে রাখিলে একটা লোক রীতিমত পণ্ডিত হইতে পারিত। একদিন বিকেলবেলা গিরিশবাবুর ঘরেতে সকলে বসিয়া চা খাইতেছিলাম। গিরিশবাবু, অতুলবাবু, শরৎ মহারাজ, আমি ও আরও অনেক লোক ছিলাম। প্রসঙ্গ উঠিল, Duty বা কর্ত্তব্যের জন্য কার্য্য করা আমাদের ভিতর ছিল না, এটা বিদেশীভাব। ধর্ম্মের জন্য কাজ করাই আমাদের নিয়ম ছিল, যথা 'ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে'। এই কথায় সকলেই যার যা মন্তব্য বলিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজও নিজের মন্তব্য বলিলেন। যে যার নিজের মত সমর্থন করিলেন। হঠাৎ আমি বলিলাম, "কেন, আপনিই ত নিজে লিখেছেন,

'ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুখায়ে যায়,
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে?'

কেন, এ ত Dutyর জন্যই প্রাণ দিচ্ছে। 'ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে'

ত নয়। কাজ করা স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সেইজন্যই সে কাজ করে।” গিরিশবাবু শুনিয়া বলিলেন, “কোথায়,—কোথায় এ কথা আছে?” আমি বলিলাম, “কেন, বুদ্ধদেব যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, সেই স্থানে আছে।” গিরিশবাবু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, “তুমি কি বইখানা এমন ক’রে পড়েছ যে, passage quote কর্ত্তে পারো? কথাটা কি সুন্দর! কি সুন্দর!!” এই বলিয়া তিনি যেন বিভোর হইয়া পড়িলেন। মাথাটি ঝুলিয়া পড়িল এবং মাথা এদিক ওদিক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, আর অনবরত ঐ কথাটাই আওড়াইতে লাগিলেন।

গিরিশবাবু একদিন বলিতে লাগিলেন, “দেখ শরৎ, আমি একদিন সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশনে মহেন্দ্র সরকারের ইলেক্‌ট্রিসিটির লেকচার শুনতে গেলুম। একদিন ব্যাটারি দিয়ে ইলেক্‌ট্রিসিটির এক্সপেরিমেণ্ট হ’তে লাগলো। এক্সপেরিমেণ্ট খুব successful (সুন্দর) হয়েছিল। ডাঃ সরকার বেরিয়ে এসে খুশি হয়ে বললেন, ‘দেখলে গিরিশ, positive, negative pole কেমন হ’য়ে গেল।’

আমি ব’ল্লাম, ‘মহাশয়, আপনার ভাঁড়টা যদি পৃথিবীর মত হ’ত আর ঐ কাঠিটা যদি সুমেরুর মত হ’ত, তাহ’লে আপনার কোন্‌টা positive pole আর কোন্‌টা negative pole হ’ত?’ এই ত মহেন্দ্র সরকার চটে গিয়ে বল্লেন, ‘তোমরা শুধু ঐ সব যত আজগুবি গল্প কর, সায়েন্সের কিছু বোঝ না, কেবল বাজে কথা বল।’ আমি ব’ল্লাম,

'কিছু বুঝিনি বলেই ত জিজ্ঞাসা করছি।' এই কথা বলেই হাসতে হাসতে চলে এলাম।" এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গিরিশবাবুর কথার গভীর অর্থ আছে; কারণ পৃথিবীর বাহিরে চলে গেলে positive pole বা negative pole কিছু হইতে পারে না। সমস্ত সৌরজগৎ বা তদূর্ধ্ব স্থান লইলে positive বা negative pole বলিয়া কোন শব্দ হয় না। গিরিশবাবুর সহিত এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তা হইত।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কলিকাতায় থাকার বন্দোবস্ত

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কলিকাতায় আসা এবং থাকার বন্দোবস্ত গিরিশবাবু, শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজ এই তিনজনে মিলিয়া করিতেন। কারণ থাকিবার অর্থব্যয় আছে এবং উপযুক্ত স্থানে থাকা আবশ্যক, কারণ অনেকেই প্রণাম করিতে যাইতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময় কোন লোকের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করা নিষেধ ছিল। যোগেন মহারাজ যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি কাহাকেও ভিড় করিতে দিতেন না। সম্মুখে কাহারও যাওয়া একেবারে নিষেধ ছিল। কথিত আছে, কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে যান। সে ব্যক্তি জিদ করিতে লাগিল—সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিব। যোগেন মহারাজ তাহাকে নিষেধ করিলেন। অবশেষে আগন্তুক ব্যক্তি নিজের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বলিল,

"স্বামিজী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, অবশ্য আমি সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিব।" ইহাতে যোগেন মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালি দিয়া বলিলেন, "বল্‌গে যা তোর নরেনকে, এখানে আমি ভিতরে কাউকে যেতে দেবো না। এ তার বেলুড়মঠ নয় যে হুকুম চালাবে। ও রকম জোর করে যদি কথা কও ত ঘাড় ধরে বার করে দেবো।" তখন লোকটি বিনীত হইয়া পড়িল এবং যোগেন মহারাজের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলিয়া আসিল। মোট কথা, যোগেন মহারাজ যতদিন জীবিত ছিলেন, কেহই সম্মুখে যাইতে পারিত না। এই প্রথাই বরাবর ছিল, পরে শরৎ মহারাজ সাধারণ লোককে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্মুখে যাইতে দিয়াছিলেন।

বলরামবাবুর মৃত্যু-সময় সেবা করা

ইং ১৮৮৯ সালে যখন প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল অনেকেই ঐ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। বলরাম বাবু, নিরঞ্জন মহারাজ ও আমি, গোপাল কবিরাজের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল, তাহাকে দেখিতে যাই। বলরামবাবু গোপাল কবিরাজকে পাইয়া অনেক আনন্দ করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "ও কবরেজ, এইবার লুচির খোলা চড়ল।" এইরূপ অনেক হাসি-তামাসা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই দিনই তাঁহার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল এবং পরে ডবল নিউমোনিয়া হইয়া মারা যান। এই সময় শরৎ মহারাজ, গুপ্ত মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ (শিবানন্দ স্বামী) বলরামবাবুর দিনরাত

সেবা করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, দিনরাত্রি জাগিয়া রোগীর কাছে থাকিতেন। মুখে কোন বিরক্তির ভাব ছিল না। অবশেষে বলরাম বাবু মারা যান। শরৎ মহারাজের ভিতর যে সেবা ভাবটা স্বভাব-সিদ্ধ এইটা তখন ফুটিয়া বাহির হইল। কারণ অপর সকলে সাধন-ভজন ও বেদান্ত চর্চ্চা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কেবলমাত্র শরৎ মহারাজ সেবা কার্য্য লইয়া থাকিতেন। নীরস কঠোর ভাব তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিত না, কিন্তু ভক্তি ও সেবার ভাবটা তাঁহার যেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিত। এই সময় গিরিশবাবু শরৎ মহারাজকে একটি গল্প ব'লেছিলেন।

গিরিশবাবুর ঝিএর গল্প

দেখ শরৎ, বহুকাল আগে যখন ডেঙ্গু জ্বর হয় (১৮৬৯ সালে) তখন আমাদের বাটীতেও সকলের জ্বর হয়েছিল। সকলেরই গায়ে বড় ব্যথা, সকলেই শুয়ে রয়েছে। ঝি মাগী সকলকে শুয়ে থাকতে দেখে ঝাঁটা হাতে ক'রে পাট করতে লাগল। মাগী ত ভারী চটেছে, বলতে লাগল, "আ পোড়ার ভগবান, তোমার কপালে এই ঝাঁটা মারি। সকলকে জ্বর দিয়েছ, বেশ আরাম করে শুয়ে আছে, আর আমি সকাল থেকে খেটে মরি। আমার কথা মনে নেই? তোমায় সাত ঝাঁটা মারি," বলিয়া ঝাঁটাটা মাটিতে আছড়াইতে লাগিল। খানিক পরে মাগীটা বল্ল, "যাই, একটু শুইগে।" যেমনি শোঁয়া,

অমনি গা কামড়ানি আর জ্বর। মাগী শুয়েই বকতে সুরু করলে, "আ পোড়ার ভগবান, তুমি ওৎ পেতে, কান খাড়া ক'রে বসেছিলে, আমি যেমনি বল্লুম অমনি জ্বর দিলে। কেন, ভাল কথা যখন বলি তখন কানে তুলো দিয়ে থাক, শুনতে পাওনা, আর খারাপটার বেলায় অমনি কান পেতে শুনে নাও। দাঁড়াও সেরে উঠি, উঠে ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝাড়বো।" আমরা ত সকলে শুয়ে শুয়ে ঝি মাগীর কথা শুনছি আর অমন জ্বরেতেও হাসছি।

ফকিরের মৃত্যুকালে সেবা করা

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বা ফকির (যাহাকে নরেন্দ্রনাথ ফকির-উদ্দিন হালদার বলিতেন) যুবা ব্যক্তি ; তাহার galloping থাইসিস হয়। বলরামবাবুর বাটীর পূর্ব্ব দিকের ঘরটিতে তাহাকে রাখা হয়। তুলসী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ তাহাকে সেবা করিয়াছিলেন। Galloping থাইসিস অতি সংক্রামক রোগ, আরোগ্য হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ফকির গরীব লোক, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, বাবুরাম মহারাজের কুল-গুরুর পুত্র। চিকিৎসার জন্য, ঔষধ ও পথ্যের জন্য, বিশেষ খরচ আছে। শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজ পাঁচজনের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল এবং তুলসী মহারাজের সহিত একযোগে, নিতান্ত আপনার লোকের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল। আমি যখন ফকিরকে দেখিতে যাইতাম,

আড়ালে সকলে আমাকে বলিয়া দিত, ফকিরের মাথার কাছে বসো না, পায়ের কাছে বা দূরে বসিবে, কারণ ওর থুতু ও নিঃশ্বাস বড় সংক্রামক। ফকিরের বাঁচিবার কোন আশা ছিল না কিন্তু শরৎ মহারাজ ও তুলসী মহারাজ নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া দিনরাত ফকিরের সেবা করিতেন এবং ডাবরের রক্ত ও থুতু পরিষ্কার করিতেন। শরৎ মহারাজের ভিতর তখন এই ভাবটা ছিল যে, নিজের ত কিছুই হইল না এবং অপর কারও কিছুই করিতে পারিলাম না তবে লোকসেবা করিতে করিতে যদি প্রাণটাও যায় তাও ভাল। এইভাবে তিনি তখন ফকিরের সেবা করিয়াছিলেন। আমি যখন সাবধান হইতে বলিতাম তখন ঐ কথাটি বলিয়া আমাকে ক্ষান্ত করিতেন। এইরূপ উত্তরের উপর আমি আর কি কথা বলিব, সেইজন্য নীরব হইয়া থাকিতাম কিন্তু মনে বড় আশঙ্কা ও কষ্ট হইত। সেবাভাবের প্রকৃত অর্থ তখন তিনি জীবনে দেখাইয়াছিলেন। ফকিরের জ্ঞান থাকিতে থাকিতেই তাহাকে তীরস্থ করা হইয়াছিল। নিজে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, কপালে ও বুকে গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়া কি কি লিখিতে হয়, ফকির নিজেই সব বলিয়া দিল। স্থির নিরুদ্বেগ-চিত্তে খাটে শুইল এবং সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে তীরস্থ করা হইল। অল্পক্ষণ পরে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। শরৎ মহারাজ ফকিরের মৃত্যু ও নির্ভর দেখিয়া বড় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং আমাকে অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "কই হে, তোমার

কটা Christian saint আছে, যে মরবার সময় এইরূপ ঈশ্বরে নির্ভর ক'রে মরতে পারে। এই ত অনেক saint ও মহাপুরুষের কথা শুনি, দেহ ছাড়বার সময় মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর এই ফকির ড্যাং ড্যাং করে মরতে গেল। একেই বলে ঈশ্বরের উপর নির্ভর।" যাহা হউক, ফকিরের মৃত্যুটা মহারাজের প্রাণে বড় লাগিয়াছিল এবং এ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। ফকির বিছানায় পড়িয়া এ কথাটি প্রায়ই বলিত—

"কোথায় মা দুর্গে দুঃখহরা
দেখা দাও গো ওমা তারা।"

ফকিরের আর একটি প্রিয় কবিতা ছিল,

"কি কব লজ্জার কথা,
লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর পরশনে।"

স্বামিজীর তামাক প্রিয়তার কথা

শরৎ মহারাজ একদিন বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বাপু, বড় গুড়ুক-খোরের বংশ। তোমাদের ভায়ে ভায়ে দেখছি তামাকের উপর বড় ঝোঁক। আজ এক গল্প বলি শোন। নরেন, আমি ও আর কয়েকজন মিলে পাহাড়ের উপর ঘুরছি। মাধুকরী করে খাই আর যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। নরেন গুড়ুক খোর জেনে তার জন্য একটা ছোট হুঁকো, একটা

কলকে আর একটু তামাক নিয়ে ঘুরছি। একদিন নরেনের ভারি বৈরাগ্য এল; এই ত আমার উপর ভারি বকাবকি সুরু করলে। বললে, 'সব ছাড়লুম, ভিখিরী হয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাচ্ছি, আর এই তুচ্ছ তামাক খাওয়া ছাড়তে পারব না! তুই শালাই ত যত নষ্টের গোড়া, সঙ্গে সঙ্গে হুঁকো কলকে নিয়ে বেড়াবি আর তামাক খাওয়াবি।' এই বলেই ত আমার উপর মহা খাপ্পা। হুঁকোটা আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে দিলে, কলকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর পাহাড়ী শুকনো ভূরা তামাক ছড়িয়ে ফেলে দিলে। যা' হোক সেদিনটা ত একরকম কেটে গেল। আমার পা ফুলেছিল, সেইজন্য দোক্তা পাতা বেঁধে রেখেছি। রাত্রে দোক্তা পাতাগুলো ফেলে দিয়ে শুয়ে আছি। রাত দুপুর একটার সময় নরেন উঠে বসল, আর জিদ ধরলে 'শরৎ, একটু তামাক খাওয়া, নয়ত ঘুম হচ্ছে না।' আমি বললুম, 'তামাক কোথা পাই, তুমি ত সব ভেঙ্গে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছ।' তখন কি করি, আমি আর নরেন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে সুরু করলুম। তখন আবার আমায় বল্লে, 'তুই যে পায়ে দোক্তা পাতা বেঁধেছিলি, সেগুলো কি ক'রলি?' আমি বল্লাম, 'ছি, ছি ও ছুঁতে নেই।' নরেন বল্লে, 'দূর শালা! সময়ে সব জিনিষ শুদ্ধ।' এই বলে হাতড়ে হাতড়ে সে দোক্তা পাতাগুলো নিয়ে এলো। তারপর একটু আগুন করা গেল। সেই দোক্তার পাতাগুলো একটা কলকেয় সেজে তামাক খেয়ে তবে মন্দারাম একটু সুস্থ হ'ল,

মুখে হাসি বেরুল।" এই বলে শরৎ মহারাজ হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "তোমাদের তামাক খোরের বংশকে বলিহারি!"

পাহাড়ে মাছের ডিম খাইয়া পেট নামান

শরৎ মহারাজ একদিন গল্প বলিতে লাগিলেন, "নরেন, আমি আর কয়েকজন আলমোড়ায় আছি। একদিন একটা মাছ পাওয়া গেল, তার পেটে খুব ডিম ছিল। সেই ডিমের বড়া করা গেল। নরেন অনেকগুলো খেলে। সেই ডিমের বড়া খাবার ঘণ্টা খানেক পরে পেট নামান সুরু হ'ল, তারপর সেটা কলেরা ধাঁজের দাঁড়াল। সকলের বড় ভয় হ'ল। তারপর বদরিশাকে খবর দিলাম। বদরিশা ত প্রথম এসে বড় ভয় পেয়ে গেল। তারপর বাহ্যেটা বেশ করে দেখতে লাগল। দেখে না, গুঁড়ি গুঁড়ি মাছের ডিম বেরিয়েছে। বদরিশা বললে, 'এ, মহারাজ, মাছের ডিম খেয়ে ওটা হয়েছে। ওটা এদেশে খেলে বড় পেট চলে তাই ওটা এখানে খাবেন না।' তারপর ঔষধ দিলে, তা খেয়ে ভাল হয়ে গেল।" এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য স্থানে মাছের ডিম কেউ খায় না। ইংরাজীতে মাছের ডিমকে fish roe বলে। ইংরাজেরা খায় না। তাহাদের এইটাতে নিতান্ত ঘৃণা বা ভয় আছে। আমি কিন্তু লণ্ডনে অবস্থানকালে অনেকবার মাছের ডিম খাইয়াছি, খাইতে বেশ সুস্বাদু কোন ব্যামো হয় না।

ইংরাজদের ঐ ঘৃণাটা হচ্ছে জাতীয়তা। ইংরাজেরা মাছের মুড়ো খায় না। তাহারা মাছ ভাজা বা সিদ্ধ করিয়া খায় বলিয়া মুড়োটা সুবিধা করিতে পারে না, তাই খায় না। আমি য়ুরোপের অনেক স্থানে মাছের ডিম খাইয়াছি, বেশ সুস্বাদু। আমেরিকানদেরও মাছের ডিমে ইংরাজদের মত ঘৃণা।

"মহারাজ" শব্দ

এখন কেউ সাধু হইলেই তাহার নামের সঙ্গে "মহারাজ" শব্দ যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বরাহনগর বা আলমবাজার মঠে এইরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইত না। কেহ নাম ধরিয়া ডাকিত, কেহ বা নামের সঙ্গে "বাবু" শব্দ যোগ করিয়া ডাকিত, যথা,—রাখালবাবু, শরৎবাবু, তারকবাবু ইত্যাদি। তখন প্রথম অবস্থা, এখনকার মত আদব-কেতা কিছুই ছিল না। তবে এইমাত্র প্রভেদ ছিল যে, সন্ন্যাসীরা ত্যাগীভক্ত আর অপরে গৃহীভক্ত। এ প্রভেদও অতি সামান্য মাত্র ছিল। প্রাধান্য কাহারও ছিল না। গুপ্ত মহারাজ, (সদানন্দ স্বামী) পশ্চিমের লোক। পশ্চিমে—ব্রাহ্মণ, সাধু প্রভৃতি মাননীয় লোককে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়; এইজন্য সম্মান করিয়া গুপ্ত মহারাজ সকলের সহিত "মহারাজ" শব্দ দিতে সুরু করেন। ক্রমেই এটা একটা প্রথা হ'য়ে উঠলো। এখন একটা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এইজন্য গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে।

পাহাড়ী মেয়ের সরলতা

শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "আমি পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামটা নদীর ধারে। একটা বাড়ীতে গিয়ে মাধুকরী চাহিলাম। তাহারা খাবার জিনিষ সব, থালা বাটি ক'রে সাজিয়ে দিলে। আমার তখন ইচ্ছা হ'ল নদীর ধারে একটু নিরিবিলিতে খাব। হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে অনেকে ছত্র হইতে রুটি লইয়া, নদীর ধারে একটা পাথরের উপর রাখিয়া আহার করে। অদ্যাপি সেই প্রথা বর্ত্তমান আছে। এটা একটা বড় আমোদের খাওয়া। আমার তখন ঐরূপ করিয়া খাইতে ইচ্ছা হইল। নদীর ধারে আহারাদি সমাপন করিয়া থালা বাটি মাজিয়া গৃহস্বামীর বাটী পৌঁছাইয়া দিলাম। সেই বাটীর একটি মেয়ে বলিল, 'এ মহারাজ, তুমি কষ্ট ক'রে থালা বাটি মেজে নিয়ে এলে কেন? নদীর ধারে রেখে দিলেই হ'ত, আমি গিয়ে মেজে নিয়ে আসতুম।' আমি বলিলাম, 'নদীর ধারে রেখে এলে যে অপরে চুরি ক'রে নেবে।' মেয়েটি সরল মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'অপরে নেবে কেন, ও যে আমাদের জিনিষ, তাদের জিনিষ ত নয়, তারা নেবে কেন?' আমি তখন তাহাকে একটু বুঝাইয়া বলিলাম যে, লোকে এমনি করিয়াই লইয়া থাকে, বা তাহাকে চুরি করা বলে। কিন্তু মেয়েটি এমন সরল যে, একজনের জিনিষ অপরে কেহ লইতে পারে ইহা সে ধারণা করিতে পারিল না। তখন সেই মেয়েটি বলিল যে, সে সব গ্রামে চুরি হয় না।

তারা থালা বাসন নদীর ধারে রাখিয়া আসে এবং সময় মত মাজিয়া আনে।” শরৎ মহারাজ বলিতেন, “মেয়েটির সরল কথা ও ভাব দেখিয়া আমার মনে যে কি আহ্লাদ হইতে লাগিল তাহা আর কি বলিব।”

পাহাড়ের 'খুনীবরফে' পড়া

শরৎ মহারাজ বলিলেন যে, একবার নরেন, আমি ও সান্যাল হিমালয়ের পাহাড় দিয়ে যাচ্ছি। আকাশটা মেঘলা ঘোর ঘোর ক'রে এল। দূরে একটা লোক ভেড়া চরাচ্ছিল। সে আমাদের বললে, “বাবাজীরা শীগগির করে পালাও, একটা আশ্রয় লও।” এই ব'লে সে তার ভেড়া নিয়ে ছুটে ছুটে পালাতে লাগল। আমরা ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না তবে একটু হেঁকে চলতে লাগলাম। তারপর বরফ পড়তে সুরু হ'ল। বরফটা যেন শিলাবৃষ্টির মত, তবে একটু লালচে। পরে শুনলুম যে, সে বরফ যেখানে লাগবে সেখানটা জ্বলে যাবে ও ঘা হ'য়ে যাবে। আমরা ত গিয়ে একটা পাহাড়ের গুহা পেলুম, তার ভেতরে ঢুকে পড়লুম। তার পরে ত গায়ের কাপড় চোপড় তেমন কিছু ছিল না, বড় ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। শীতে যেন কালিয়ে গেলুম। তার উপর সঙ্গে খাবার দাবারও কিছু নেই। নরেন বললে যে, সকলে ধ্যান করি এস, ধ্যান করতে করতে দেহ ছেড়ে দেবো। ধ্যান ত করতে বসলুম, কিন্তু ধ্যান ত কিছুতেই হয় না। শীতে কালিয়ে যাচ্ছি। এমন

সময় সান্যাল বললে যে, তার কাছে গোটা কতক কাল-মরীচ আছে, দু' চারটে মুখে দিলে, শরীরটা গরম হ'তে পারে। অমনি সকলে গোটা কতক ক'রে কাল-মরীচ মুখে দিয়ে ধ্যান করতে বসা গেল। যা হোক শরীরটা একটু গরম হ'ল, এবং সে সময়টা প্রাণ বেঁচে গেল। সাধুগিরির জীবনে নানান কষ্ট হয় কিন্তু নির্ভরের ভাবটা খুব বাড়িয়ে দেয়। নিঃসঙ্গ-ভাবে সাধুগিরি না কল্লে ঠিক নির্ভরের ভাবটা আসে না।

খুনী-বরফের সম্বন্ধে দীন মহারাজ একটা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যখন হিমালয়ে ঘুরিতেছিলেন তখন তাঁহার গায়ে খুনী-বরফ লাগিয়াছিল। ঐ ধাঁজের বরফ দেখিতে লাল সেইজন্য তাহাকে রক্তবর্ণ খুনী-বরফ বলে। ভেড়াওলা পাহাড়ীরা এই খুনী-বরফকে বড় ভয় করে। দীন মহারাজের গায়ে ঐ খুনী-বরফ লাগিয়া ঘা হইয়া গিয়াছিল। ঐ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার কি, তা জানি না।

সান্যাল মহাশয়

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, যাঁহাকে শাণ্ডেল মশাই বলিয়া ডাকা হয়, তাঁহার নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে, নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে চলিয়া যাইলে তিনিও হিমালয়, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পরে সকলের উপদেশ অনুযায়ী তিনি পুনরায় নিজের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। শাণ্ডেল মশাই সকলের শ্রদ্ধেয় এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সময়কার লোক।

নরেন্দ্রনাথের ভগ্নীর মৃত্যু

যখন আমার ছোট ভগ্নী যোগেন্দ্রবালা সিমলা পাহাড়ে আত্ম-হত্যা করে, নরেন্দ্রনাথ তখন আলমোড়ায়। সেদিন রবিবার, আমি বরাহনগরের মঠে গেলাম এবং সেখান থেকে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যে বাটীতে থাকিতেন সেই বাটীতে গেলাম। সে বাটী এখন আর নেই। গিরিশ বাবু সেদিন সে-বাটীতে গিয়াছিলেন। যোগেন মহারাজ অধ্যক্ষভাবে থাকিতেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এ বিষয় নরেনকে খবর দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু নরেনকে খবর দিলে সে বিরক্ত হইবে এইজন্য শরৎকে খবর দেওয়াই শ্রেয়ঃ। এইজন্য যোগেন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও আমি, এই তিনজনে হাওড়া স্টেশনে গিয়া আলমোড়ায় বদরিশার বাটীতে শরৎ মহারাজের নামে টেলিগ্রাম করিলাম। সময়মত শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথকে ঐ টেলিগ্রামখানি শুনাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন বৈরাগ্যভাব অতি প্রবল, টেলিগ্রাম শুনিয়া অতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোরাই বাংলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া চিঠি দিয়া এত গোলমাল বাধালি। আমি বাংলা দেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়েছি, তোদের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রাখবো না।" আলমোড়ার টেলিগ্রামে মৃত্যু সংবাদ পাওয়ায় নরেন্দ্রনাথ বিশেষ দুঃখিত হন এবং শরৎ মহারাজকে ভৎ'সনা করিয়া বলেন. "তুই শাল্লাই ত

কলকাতার খবর রাখিস আর যত আবর্জ্জনা জড়াস। আমাকে সব সময়ে তুই বিরক্ত করিস। আমি জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না, তুই কেবল সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি।” সকলেই একটু ভীত হইল; কারণ নরেন্দ্রনাথ হয়ত একাকী কোনদিন চলিয়া যাইবেন। কারণ এই সময় নরেন্দ্রনাথ আর সাধারণ লোকের মত ছিলেন না। যেমন জপ-ধ্যান, তেমনি বৈরাগ্য, তেমনি নির্ভর। জ্বলন্ত অগ্নিস্তূপের মত হইয়াছিলেন। আমরা তখন যেমন ভালও বাসতুম তেমনি ভয়ও করতুম।

হৃষীকেশ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে যাওয়া

পাহাড়ে কিছু দিন থাকিয়া সকলে হৃষীকেশের দিকে চলিল এবং তথায় কিছু দিন বাস করিয়াছিল। এই স্থানে নরেন্দ্রনাথ গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন এবং সকলে শুনিতেন। কয়জনে অতি ঘনিষ্ঠভাবে থাকায় সকলে বলিত, “দেখ, এদের পরস্পরে গুরু-ভায়ের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ও টান। এইরূপ পরস্পর ভালবাসা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।” এইস্থানে নরেন্দ্রনাথের অসুখ হয়। অসুখ সারিলে পথ্যের জন্য খিচুড়ির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রাখাল মহারাজও ঐ সময়ে ঐ স্থানে গিয়া হাজির হন: অনেকেই এই সময় একত্রিত হইয়াছিলেন। রাখাল মহারাজ অল্প বয়স্ক ও বালক-স্বভাব,—খিচুড়িতে এক ডেলা মিছরী দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ খাইতে গিয়া খিচুড়ি মিষ্টি বোধ করিতে লাগিলেন এবং একটা সুতো বাহির হইল।

এই ত রাখাল মহারাজের রাঁধবার কেরামতি বেরিয়ে পড়ল আর বকুনি খেতে লাগল। তার কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হইলে সকলে মীরাটে চলিয়া আসিলেন। মীরাটে কিছুদিন থাকিয়া সকলে ছোড়ভঙ্গ হইয়া গেলেন। শরৎ মহারাজ বরাহনগরের মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এখন আমার এই রূপই স্মরণ হইতেছে এবং তদনুযায়ী লিখিলাম।

মূর্ত্তিপূজা ও নিরাকারের ধ্যান

শরৎ মহারাজ অনেকদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি বরাহনগরের মঠে দেখিতে যাইলাম। স্বভাব অতি ধীর, নম্র, বিনয়ী, যেন আগেকার লোক নন। কথাবার্ত্তা অতি মিষ্ট। জগৎ হইতে যেন পৃথক ব্যক্তি, মঠ-সংক্রান্ত কোন কথাবার্ত্তায় যেন আর মন নাই। কয়েক বৎসর যেমন অতিথি ও অভ্যাগত হইয়া পরের বাটীতে আহারাদি করিয়াছিলেন বরাহনগর মঠেও ঠিক সেইভাবে রহিলেন। কোন কথাতে কান দিতেন না বা কোন কথাতে থাকিতেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, শরতের বেশ উন্নত অবস্থা হইয়াছে। একদিন কথা উঠিল যে, ধ্যান করিবার সময় নিরাকারের ধ্যান প্রশস্ত না সাকার ধ্যান প্রশস্ত। অর্থাৎ বিগ্রহাদি পূজা করা চলিতে পারে বা নির্গুণ ব্রহ্মেরই চিন্তা করা চলিতে পারে। এই বিষয়ে আমার সহিত নানা কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ তখন বেদান্তের চর্চ্চা করেন এবং হৃষীকেশ প্রভৃতি

স্থানে নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়াছিলেন। এই জন্যই তখনকার মনোভাব অনুযায়ী বলিতে লাগিলেন, "দেখ, বিগ্রহ পূজা করা প্রথম অবস্থার কার্য্য, মনটা একটু উপরে উঠিলে আর বিগ্রহ-পূজার তত আবশ্যক হয় না, তখন নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করা যায়। অবশ্য নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেইটাই ঠিক পথ। কারণ বেদান্ত ও অপর সকল শাস্ত্র এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। কিন্তু বিগ্রহ-পূজায় একেবারেই কিছু হয় না এবং ইহার যে কোন আবশ্যক নেই এ কথাই বা কি করে বলি? সাধারণ লোক নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা বা ধ্যান করিতে অক্ষম। ইহাদিগকে নির্গুণ বলিলে একটা আকাশ বা শূন্য বুঝিবে। তাহাতে ইহাদের কিছুই শান্তি আসিবে না। পরন্তু বিগ্রহ পূজা করিতে বলিলে তবু অনেকটা শান্তি পাইবে এবং এই বিগ্রহ পূজা হইতেই মন উপরে উঠিবে। আরও এক কথা, দেখ, তিনি ত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব) বিগ্রহ পূজা করিতেন এবং এই বিগ্রহ-পূজা হইতেই তাঁর মন ত উপরে উঠিয়াছিল। এ সব ত চোখের উপর দেখলুম। ব্রহ্মজ্ঞান কি এক দিনেই হয়? এটা ধীরে ধীরে হয়। সর্ব্ব জীবেই ব্রহ্ম দেখা উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা লোকমাত্রেই হয় না আর দু'খানা বই পড়লেও হয় না। জগৎটা জড়, মনটাও জড়। মনটা যেমন জড় অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে বাহিরের জগতেরও সেই রকম জড় হইতে সূক্ষ্ম গতি আছে। মন ও জগৎ দুইটাই যখন খুব সূক্ষ্ম অবস্থায় পৌঁছায়

তখন পরস্পরকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতে পারে। সেই উচ্চ অবস্থায় সব বস্তুকেই ব্রহ্মময় দেখা যায়।" সেদিন বিকেলবেলায় শরৎ মহারাজ অনেক উচ্চ অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। আগেকার বোকা ম্যাদাটে শরৎ মহারাজ আর নাই, বেশ যেন একজন গম্ভীর বিজ্ঞ ব্যক্তির মত কথা কহিতে লাগিলেন এবং শুনিয়া আমার বেশ আনন্দ হইল। দেখিলাম উত্তরাখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরৎ মহারাজের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ইচ্ছা না থাকিলেও ধ্যান করিবে কি না

আর একদিন প্রশ্ন উঠিল যে, ইচ্ছা না থাকিলে জপধ্যান করা উচিত কি না। আমি বলিতে লাগিলাম, "দেখ, মনটা যখন জপধ্যান করতে চাচ্ছে না তখন তাকে জোর করে জপ-ধ্যান করান ঠিক নয়। মনটা বড় ক্লান্ত হয়েছে ও একটু জিরুতে চাচ্ছে, ওকে একটু জিরুতে দেওয়া ভাল। জোর করে জপধ্যান করলে সেটা মৌখিক হয়, ভেতরে কাজ হয় না। তাহাতে বিশেষ উপকার না হইয়া অনেক সময় অপকার হয়।" শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "না হে, ওরকম নয়। মনটা বড় পাজী, ওকে নিয়মিত সময়ে জপধ্যান করান উচিত। এই জন্য নিয়মিত অভ্যাস রাখা ভাল। তা না হলে মনটা হয় ত জপধ্যান করতে চাইবে না। আর একটা কি জান? অভ্যাসের ত একটা গুণ আছে। জপধ্যান করতে বসলে মনটা খানিকক্ষণ স্থির না হ'লেও, খানিক পরে ত হ'তে পারে।

নিয়মিত অভ্যাস রাখাটা খুব ভাল।” এইরূপে উভয়ের মধ্যে নানা প্রকার কথা হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে, উভয়েই এক বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দর্শন করিতেছে। এই জন্য এক ব্যক্তি অভ্যাসের উপর বিশেষ জোর দিতেছে অপর ব্যক্তি মনের সতেজ অবস্থার উপর জোর দিতেছে। যাহা হউক, জিনিষ একই দাঁড়ায়।

৺পুরীধামে যাওয়ার কথা

বরাহনগর মঠের সময়েতে শরৎ মহারাজ একবার ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ দর্শন ইত্যাদি করিয়া অনেক সময় মন্দিরে বসিয়া থাকিতেন এবং মন্দিরের যে ছায়া পড়ে সেইটা মাপ করিয়া ত্রিকোণমিতি অনুযায়ী মন্দিরের উচ্চতা অনেক পরিমাণে নির্ণয় করিয়াছিলেন। কারণ কলেজেপড়া ছেলের শুধু জগন্নাথ দেখিয়া মন স্থির থাকিতে পারে না, মন্দিরের মাপজোপ ইত্যাদির দিকেও মনটা চলিয়া যায়।

শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, “একটা লোক মন্দিরের চক্রের গায়ে ধ্বজা বাঁধিতে উঠিল। যখন চক্রের কাছে গেছে, লোকটাকে চক্রের নাভি পর্য্যন্ত দেখিতে হইল। তাহা হইলে চক্রটা মানুষের দ্বিগুণ। অর্থাৎ মানুষ যদি সাড়ে তিন হাত হয়, চক্রটার ব্যাস তা হ'লে সাত হাত। সেই চক্রটাকে ছোট্ট একটুখানি বোধ হ'চ্ছে। তা'হলে মন্দিরটা কত উঁচু বিবেচনা কর।”

শিব শ্মশানবাসী কেন

একদিন বলরাম বাবুর বার উপরকার দালানে পায়চারিটী করিতে করিতে কথা উঠিল, শিব শ্মশানবাসী কেন? শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "সব দেবতাই নিজে আলাদা আলাদা থাকতে চাচ্ছে। তাদের বিশেষ পূজাপদ্ধতি, বিশেষ পূজক, বিশেষ ভক্ত। এই সকল লোকের বাহিরে যারা, তাহাদিগকে যেন সে দেবতা আশ্রয় দেবে না। এই বিষ্ণুর দেখ, পূজার নানা কড়াকড়ি নিয়ম, কত পূজাপদ্ধতি, কত অনুষ্ঠান, আর জনকতক পূজক ছাড়া আর কেউ ছুঁতে পারবে না। যেন অপর কেউ ছুঁলে ঠাকুর বাবাজী অক্কা পেয়ে যাবেন, নয় ত অশুচি হয়ে যাবেন। আবার তাকে নাওয়াও রে, ধোয়াও রে, কত হাঙ্গামা বেরুবে। ঠাকুরটি যেন কায়ক্লেশে প্রাণ বাঁচিয়ে রয়েছে। পাছে কেউ তাকে ছোঁয় এইজন্য কোনরূপে যেন জাত বাঁচিয়ে রয়েছে। আবার ঠিক নিয়মমত পদ্ধতিতে ফুল না ফেল্লে, মন্ত্র ক'টা না আওড়ালে, ঠাকুরবাবাজী রেগে টং। আর তার পূজা নেবেন না, খাওয়া নেবেন না। এঁরা সব সময়ে রেগেই আছেন। সামান্য এদিক ওদিক হ'লেই পূজা করা বন্ধ হয়ে গেল; সব নষ্ট হ'লো। এই ত হ'লো বিষ্ণু-বাবাজীর ব্যাপার।

আর শিব, দেখ, শ্মশানে পড়ে আছে। যত উৎসৃষ্ট জিনিষ, শ্মশানের ছাই ভস্ম, হাড়ের মালা এই সব গায়ে মেখে বসে

আছে। শুচি অশুচির অতীত লোক। যে, যে-ভাবে যে-জিনিষ দিয়ে পূজা করতে ইচ্ছা করে, তাই চলে। কোন জাতি বা বর্ণভেদ নেই। আর দেখ, যত অভাগা যাদের কেউ স্থান দেয় না, শিব সেইগুলোকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এই দেখ, ভূত-প্রেত, দানব-দৈত্য, যাদের অন্য কোন দেবতা আশ্রয় দিলে না, শিব সেই সবগুলোকে নিজের কাছে নিয়ে বসে আছে।

আচণ্ডাল শিবপূজা করতে পারে, তাকে কেউ বারণ করে না। এই শিবরাত্রের গল্প দেখ না, ব্যাধ খেয়ে দেয়ে তার মাংসের পুঁটলি গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সেই মাংসধোয়া জল শিবের গায়ে লেগেছিল, তাতেই শিব সন্তুষ্ট। কিন্তু ব্যাধ বা চণ্ডাল অন্য পূজা করতে পারে? এক শিবপূজাতেই কোন নিয়ম নাই। এই পূজাটাতেই হিন্দুদের খুব broad catholic view দেখান হয়েছে। এইজন্যই শিবকে দেবাদিদেব মহাদেব বলে এবং এই শিবই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা।" সেদিনকার শরৎ মহারাজের শিবের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। তিনি সেদিন খুব উত্তেজিত হইয়া শিবের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"খোল গড়িবার মাটি" শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের সমাধি

একদিন বলরামবাবুর বড় ঘরটিতে আমি ও শরৎ মহারাজ বসে আছি, এমন সময় ভক্তির কথা উঠল। তারপর দু'জনেই দালানটাতে বেরিয়ে এলাম। ওদিককার ঘরে চা হয়েছে;

চা খেতে যাচ্ছি এমন সময় শরৎ মহারাজ বলিতে সুরু করিলেন, "ওহে, একটা কথা তিনি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বলতেন জান? একদিন শ্রীচৈতন্য জনকতক লোক সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে একটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করায় গ্রামবাসীরা গ্রামের নাম বলিল। গ্রামবাসীরা প্রসঙ্গক্রমে বলিল যে, সেই গ্রামের মাটি বড় ভাল, তাহাতে বাজাইবার খোল হয়। চৈতন্যদেব সেই কথা শুনিয়া গ্রামের মাটিকে প্রণাম করিয়া একেবারে সমাধিস্থ; অর্থাৎ এই গ্রামের মাটিতে খোল হয়, সেই খোল সংকীর্ত্তনে বাজে এবং হরিনামের রোল পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে এবং ইহাতেই হরিপ্রেমের বন্যা বহিয়া যায়। এই সকল চিন্তা উপর্য্যুপরি পর্য্যায়ক্রমে আসায় তিনি যেন শ্রীহরিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন এবং সমাধিস্থ হইলেন।" আমি বলিলাম, "এটা হচ্ছে weakness of nerves, strong nerves নয়। Control করতে পারলে না তাতেই emotionএ অভিভূত হ'য়ে পড়লো। এটা grandeur নয়, এটা weakness." শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "না হে না, এটা হচ্ছে 'Law of associations'। সামান্য জিনিষের সহিত উঁচু জিনিষের কি সম্পর্ক আছে এবং মনটা কি নিয়মে একস্থান বা জিনিষ হইতে অন্য স্থান বা জিনিষে চলিয়া যায়, এইটাই হচ্ছে কথাটার মূল অর্থ। এ কথাটার ভেতর বোঝবার ঢের জিনিষ আছে।" কিন্তু আমি যতই বলিতে লাগিলাম যে, না, ওটা weakness

of the brain, শরৎ মহারাজ ততই বলিতে লাগিলেন, "না হে না, ওটা স্বতন্ত্র জিনিষ।"

গুপ্ত মহারাজকে দুধ খাওয়ান

গুপ্ত মহারাজ পশ্চিমে লোক, পশ্চিমের ঘি-দুধ খাওয়া শরীর। বরাহনগর মঠে এসে দুঃখের খাওয়া খেয়ে আর ম্যালেরিয়ার স্থানে পড়ে থেকে তার খুব জ্বর হ'লো। শরৎ মহারাজ এর ওর কাছ থেকে কিছু টাকার যোগাড় ক'রে গুপ্ত মহারাজকে দুধ খাওয়াতে সুরু করলেন এবং সর্ব্বদাই নিজের চোখে চোখে রাখতেন। শরৎ মহারাজ যেন গুপ্ত মহারাজের এক প্রকার অভিভাবক হইয়া উঠিলেন। গুপ্তকে কেহ অপ্রিয় কথা বলিলে তখন শরৎ মহারাজ ও কালী বেদান্তী তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

গুপ্ত মহারাজ পশ্চিমে লোক, অল্প স্বল্প কিছু বাংলা জানত। বাংলার কোন নূতন কথা শুনিলেই সে বালকের মত লুটোপুটি খেত। তখন শরৎ মহারাজ তাহাকে বাংলা কথার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন এবং ধীরে ধীরে গুপ্ত মহারাজকে বাংলা শিখাইতে লাগিলেন। বরাহনগরের মঠের শেষ সময়টা গুপ্ত মহারাজের আর মঠে থাকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল এবং সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন শরৎ মহারাজের পরামর্শ অনুযায়ী গুপ্ত মহারাজ নিজের দেশ জোয়ানপুরে (কাশীর সন্নিকটস্থ) চলিয়া গেলেন।

তাহার পিতা যতুনাথ গুপ্ত তখন জীবিত ছিলেন। এই গুপ্ত-মহারাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে শরৎ মহারাজ খুব মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন সেইজন্য এই সকল কথা এ স্থানে প্রদত্ত হইল।

শরৎ মহারাজের খৃষ্টীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করা

শরৎ মহারাজ উত্তরাখণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাহনগর মঠে রহিলেন। উত্তরাখণ্ডে খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হওয়ায় শরীর কৃশ হইয়াছিল। তিনি এই সময় বাইবেল ও নানা প্রকার খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন।

শরৎ মহারাজ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থসকল অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় গ্রন্থগুলি আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া নিজে পাঠ করিতাম ও পরে শরৎ মহারাজকে দিতাম এবং উভয়ে বসিয়া খৃষ্টীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতাম। বাইবেল, Cunningham Geikieর The Life and Words of Christ, ও Farrar-এর Life of Christ এবং Life and Works of St. Paul প্রভৃতি অনেক গ্রন্থই * তিনি এই সময়ে পাঠ করেন। সকলের

---

* Cunningham Geikie প্রণীত অপর কয়েকটি গ্রন্থ : Old Testament Characters, Reformation, Hours with the Bible (12 vols.) ইত্যাদি।

F. W. Farrar প্রণীত অপর কয়েকটি গ্রন্থ : The Witness of History to Christ, Etarnal Hope, Lives of fathers ইত্যাদি।

নিকট তিনি এমন বিনীতভাবে থাকিতেন যে, অনেক সময় লোকের তাহাতে কষ্ট হইত।

বলরাম বাবুর বাটীতেও বড় ঘরটির পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের কাছে শুইয়া শরৎ মহারাজ অনেক সময় নিবিষ্ট মনে যীশু-সংক্রান্ত গ্রন্থসকল পাঠ করিতেন। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের গায়ে একখানি মাথা ও গলা পর্য্যন্ত যীশুর তৈলচিত্র ছিল। এই সময়ে যীশুর উপাখ্যান পড়িতে পড়িতে শরৎ মহারাজ ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন, চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া যাইত, কখন কখনও বা জল গড়াইয়া পড়িত। বর্ত্তমান লেখকের সহিত যীশুর বিষয়ে নানা কথা হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যীশুর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথা অতি ভক্তিসহকারে কহিতেন। বলিতেন, "কথাপ্রসঙ্গে তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলিতেন, যখন তিনি খৃষ্টীয়ভাবে কয়েক দিন সাধনা করিয়াছিলেন তখন তুই একদিন যীশুকে দর্শন করিয়াছিলেন। হাতে পায়ে পেরেক পোঁতা ছিল। যীশুর সেই রূপটি তাঁহার শরীরে মিশাইয়া গেল।" কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রনাথ দিনকতক বাইবেলের উপাখ্যান তুলিয়া অনবরত বলিয়া যাইতেন। শরৎ মহারাজও সেই সময় এই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতেন,

"If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and

nothing shall be impossible unto you.” অর্থাৎ যদি সরিষার বীজতুল্য বিশ্বাস তোমার থাকে তা হইলে এই পর্ব্বতকে সরিয়া যাইতে বলিলে ইহা তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইবে এবং অসম্ভব বলিয়া তোমার নিকট কোন জিনিষ থাকিবে না। এইরূপ নির্ভর ও বিশ্বাসের ভাব তখন শরৎ মহারাজের ভিতর খুব প্রবল হইয়াছিল। ‘The woman suffering from issue of blood twelve years’ বাইবেলের এই উপাখ্যানের শেষ কথাটি “Thy faith hath made thee whole” তিনি অনবরত বলিতেন। তখন তাঁহার কি নির্ভরের ভাব! কি ভক্তি বিনয়ের ভাব!

শরৎ মহারাজের বসন্ত রোগীর সেবা করা

এই সময় তাঁহার সেবা ভাবটা অত্যন্ত জাগ্রত হয় এবং বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীকে তিনি অম্লান বদনে গিয়া সেবা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে এক ব্যক্তির বসন্ত হয়। আমি শুশ্রূষা করিতেছিলাম। অনবরত কয়েক রাত্রি জাগরণ করায় অতি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। শরৎ মহারাজ শুনিবামাত্র গুপ্ত মহারাজকে শুশ্রূষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গুপ্ত মহারাজ একরাত্রি জাগরণ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পরদিবস প্রাতে চলিয়া গেলেন এবং শরৎ মহারাজকে বলিলেন, “রোগীর খুব খারাপ অবস্থা, আরোগ্য হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।” শরৎ মহারাজের তখন দয়া ও ভালবাসার ভাব এত প্রবল হইয়াছিল

যে, তিনি ঐ কথা শুনিয়া সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপ করিয়া শুশ্রূষা করিতে হয় দেখাইয়া দিলেন। তিনি রোগীর তক্তাপোশের পার্শ্বে একখানি চেয়ার লইয়া বসিলেন এবং যেই রোগী উসখুস করিতে লাগিল অমনি হয় বাতাস করিতেছেন, না হয় কারবলিক তৈল মালিশ করিতেছেন এবং ইহারই মধ্যে চেয়ারে বসিয়া নিজেও একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। মাঝে মাঝে স্নেহ-পূর্ণ মিষ্ট ভাষায় রোগীর অস্বস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহাই এক প্রকার ঔষধের কার্য্য করিত। শরৎ মহারাজের দেবভাবপূর্ণ কার্য্য দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। এই সময় তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, এত ত চেষ্টা করা গেল, ভগবান ত পাওয়া গেল না, আর ব্যাপারও যে কি তারও কিছু বুঝতে পারা গেল না, তবে লোকের সেবা করতে করতে দেহটা পাত করবো এই স্থির করেছি।”

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এক ভ্রাতার বসন্ত রোগ হইয়াছিল। গরীব মানুষ, দেখিবার শুনিবার তেমন লোক নাই। শরৎ মহারাজ শুনিবামাত্র তথায় চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি কাটিয়া ক্ষত হইয়াছিল। বসন্ত রোগীর চিকিৎসা; ডান হাতেরই বেশী দরকার, কারণ সর্ব্বদাই গায়ে হাত বুলাইতে ও কারবলিক তেল মালিশ করিতে হয়। ক্ষত স্থানে বসন্তের বিষ লাগিলে সংক্রামক হইতে পারে ইহাও তিনি জানিতেন। এই জন্য তিনি তর্জ্জনীতে নেকড়া জড়াইয়া অঙ্গুলীটি

উচ্চ করিয়া অপর কয়েকটি অঙ্গুলীদ্বারা রোগীর গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় ও স্নেহপূর্ণ বাক্যে রোগী অল্পদিনেই আরোগ্য হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথের মাতামহীর পীড়া

একবার নরেন্দ্রনাথের মাতামহী রোগক্রান্ত হইয়া মর মর হইলেন। শরৎ মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, গোপালচন্দ্র কবিরাজ ও যোগেন মহারাজকে লইয়া বেলা ৩টার সময় রামতনু বোসের গলির বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথের মাতাকে এমন মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন যে, সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও সাহস পাইলেন। গোপাল কবিরাজ বাগবাজার হইতে আসিবার সময় আমোদ করিতেছিলেন যে, এইবার বুড়ীর fire work (অগ্নি-ক্রিয়া) হইবে, লুচির খোলা চড়িবে ও আমি এমনি করিয়া খোল বাজাইব, এই বলিয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া সকলকে হাসাইয়া মুখে ও হাতে খোলের আওয়াজ করিতেছিলেন। কোথায় লোকে শোক করিবে, না সকলে হাসিয়া লুটোপুটি। বাড়ীতে আসিয়া নাড়ী দেখিয়া গোপাল কবিরাজমহাশয় বলিলেন, "আরে সব ফাঁক, লুচির খোলাটাই মাঠে মারা গেল। বুড়ীর ত মরবার এ সময় নয়, বুড়ী যে বেঁচে উঠবে। হা, আমাদের কপাল! কোথা লুচি খাব, খোল বাজাব, না বুড়ী ঝেড়ে উঠছে। যাঃ

হ'ক একটু করে দুধ খেতে দাও আর এই ওষধটা খাওয়াও, আর আমি রোজ একবার ক'রে এসে দেখে যাবোখন।" এই বলিয়া গোপাল কবিরাজ ফিরিয়া যাইলেন। প্রকৃতই নরেন্দ্রনাথের মাতামহী সেবার আরোগ্যলাভ করিলেন।

তখন শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সান্যাল মহাশয় ও অপর সকলে যথাসাধ্য নরেন্দ্রনাথের পরিজনের দেখাশুনা করিতেন। শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও সান্যাল মহাশয় এই তিনজনেই বিশেষ খবর লইতেন। রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজ তখন পশ্চিমে ছিলেন সেই কারণে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল না। একদিন যদি দেখাশুনা না হইত বা খবর না পাইতেন ত যোগেন মহারাজ ছুটিয়া যাইতেন। ভক্ত-সংখ্যা কম থাকায় তখন প্রত্যহই পরস্পরে দেখা-শুনা হইত এবং সকলেই সকলের খবর লইতেন। এই সময় যেন একটা ভালবাসার স্রোত বহিয়া চলিতেছিল। অপর দেশে অপর কোন সম্প্রদায়ের ভিতর এইরূপ হইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু এটি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়াই এত মিষ্ট লাগিত এবং তাহারই একটু আভাসমাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল।

আমার অসুখ

আলমবাজার মঠের সময় অতিরিক্ত চা খাইয়া আমার Blood Spitting বা রক্ত উঠা ব্যারাম হইল। অনবরত

মুখ দিয়া রক্তপিত্ত উঠিতে লাগিল, অতি দুর্গন্ধ। রক্ত পাঁচ ছয় ঘণ্টায় বন্ধ হইত না। কোন জিনিষ খাইতে পারিতাম না এবং রুচিও ছিল না। এই ব্যাপার শুনিবামাত্রই শরৎ মহারাজ খাওয়া-দাওয়ার বিষয় খুব কড়াকড়ি করিলেন এবং বিন্দুমাত্র চা পান করিতে দিতেন না। মতি ডাক্তার বলিলেন যে, এটা হচ্ছে tea poison, অতিরিক্ত চা খাইয়া চায়ের বিষ ধরিয়া গিয়াছে। বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন নাই তবে হাওয়া বদলান দরকার। শরৎ মহারাজ সেই অনুযায়ী গিরিশবাবুকে চিঠি লিখিয়া আমাকে গাজীপুরে পাঠাইয়া দেন। তুলসী মহারাজ আমাকে রেলে বসাইয়া দেন। যা' হোক গাজীপুরে গিয়া আমি সুস্থ হই।

শরৎ মহারাজের এই সময়ে ভালবাসা, যত্ন, লোকের সহিত অমায়িক ব্যবহার, সাধন-ভজন সব দিকই খুব খুলিয়া গিয়াছিল। লোকরঞ্জন ভাবটা খুব হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহাকে আড়ালে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। যথার্থই এই সময় তাঁহার জীবনটা প্রকৃত তপস্বীর ভাব ধারণ করিয়াছিল।

সামান্য গুটিকতক ব্যাপার উদাহরণ-স্বরূপ এস্থলে প্রদত্ত হইল। কিন্তু শরৎ মহারাজ গোপনে কত লোকের যে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে বা অগ্নিদাহে শরৎ মহারাজ যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছিলেন তাহা আলমবাজার মঠেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। আর একটি সদ্‌গুণ তাঁহার ভিতর পরিলক্ষিত

হইয়াছিল: তাহা হইতেছে এই যে, পূর্ব্বদিনের বাসি বা দগ্ধ অন্ন যাহা কেহ খাইতে পারিত না তাহা শরৎ মহারাজ অম্লান-বদনে ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার নাকে যে পূতিগন্ধ লাগিত না এ কথা নহে। তাঁহার এমন একটা ধৈর্য্যগুণ ছিল যে, তিনি মুখ বিকৃত পর্য্যন্ত না করিয়া স্থির হইয়া ভোজন করিতেন।

শরৎ মহারাজের ব্যাকুল ভাব

একদিন বেলা ২টা বা ২৷৷টার সময় আমি বলরাম বাবুর বড় হল ঘরটিতে যাইলাম। শরৎ মহারাজ পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের কাছে শুইয়া বাইবেল পড়িতেছিলেন। দুই এক মিনিট বসিবার পরই শরৎ মহারাজ বাইবেল হইতে আমাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনটা একেবারে বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। কোনদিকে আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। শরৎ মহারাজ 'Widow's mite' (বিধবার আধলা), এই উপাখ্যানটি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তারপর অন্য এক স্থান হইতে পড়িতে লাগিলেন, "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest." যীশু বলিতেছেন, "যাহারা শোকাক্রান্ত, আমার নিকট চলিয়া আইস; আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" শরৎ মহারাজের মনটা শান্তি পাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছিল; এই কথাটা পড়িতে

পড়িতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কোথায় শান্তি পাইব, কেই বা দেবে? সেই দিনকার তাঁর কাতর ভাব দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল শীঘ্রই যেন শান্তি পাইবেন।

কিছুদিন পরে বিশেষ কোন দিক্-নির্ণয় করিতে না পারিয়া শরৎ মহারাজের মনে বড় বিষাদের ভাব আসিল। তখন মাঝে মাঝে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "কি হ'লো? বড় একটা আশা ক'রে বাড়ী, ঘর-দোর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম। কই, কিছুতেই ত পেলুম না। শুধু ভিক্ষা করে খাওয়া আর এখানে ওখানে শুয়ে রাত কাটান, তবে এক সঙ্গে থাকতে ভালবাসি সেই জন্যে পড়ে আছি, ফিরে যেতে পাচ্ছি না।" এক এক সময় বিষন্ন ভাব এত অধিক হইত যে, তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, নিজেকে অপদার্থ মনে করিয়া মৌন হইয়া থাকিতেন। এই সময় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি জপ, ধ্যান করিতেন। সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে পড়িয়াছিলেন এই জন্য রোমান ক্যাথলিক-দের আচারব্যবহার অনেক দেখিয়াছিলেন। দিনকতক তিনি, 'Ave Maria' মন্ত্র জপ করিতে স্থরু করিলেন। তবে কতদিন বা কতক্ষণ ধরিয়া জপ করিতেন তাহা কেহ জানিতেন না। মাঝে মাঝে তিনি অতি করুণভাবে যে সব কথা কহিতেন তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছিল। শরৎ মহারাজ ও বর্ত্তমান লেখকের নিকট সর্ব্বদা যীশুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া যোগেন মহারাজের বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা হইল। বর্ত্তমান

লেখকের একটি 'Cassel' এর ছবিযুক্ত বাইবেল ছিল। তিনি সেই বইখানি দেখিতেন ও মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে পাঠ করিতেন। তাঁহার Zacharias-এর উপাখ্যানটি বড় ভাল লাগিত।

নরেন্দ্রনাথের পায়ে ধান্য, যব প্রভৃতি চিহ্ন

একদিন বৈকাল বেলা আমি গিরিশ বাবুর বাটীতে যাইলাম। শরৎ মহারাজ ভিতরকার বারাণ্ডার দিকের উভয় দরজার মধ্যস্থিত দেওয়ালটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। গিরিশ বাবু তাঁহার বিছানাটিতে বসিয়া আছেন। আমি যাইয়া শরৎ মহারাজের পার্শ্বে বসিলাম। জনৈক গনৎকারের কথা উঠিল। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "শুনেছ, দু' একদিন আগে এক গনৎকার এসেছিল, সে হাতপায়ের লক্ষণ খুব ভাল দেখতে পারে। নরেনের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ছিল না। সে নরেনের পায়ের দিকে চেয়ে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নরেনের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের তলা ও তৎনিম্নস্থিত স্থানটি দেখিয়া কহিল, 'এই যুবকের পায়ে ধান্য, যব প্রভৃতি চারিটি চিহ্ন রহিয়াছে; ইহা প্রায় সাধারণ মানুষের পায়ে থাকে না।' তারপর কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ইহার এখন যে রকম অবস্থা দেখছি তাতে ঐ সব লক্ষণের সঙ্গে ত কিছুই মিলছে না'।" কারণ নরেন্দ্রনাথ তখন নগ্ন পদে কোঁচার কাপড়টি গায়ে দিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং উপস্থিত কেহ কিছু অন্ন দিলে

গ্রহণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যতে যে বিশ্ব-বিজয়ী শক্তি হইয়াছিল তখন তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যেমন সাধারণ ভক্ত থাকে, তিনিও সেইরূপ ছিলেন, তবে একটু মাত্র প্রভেদ ছিল। এই সমস্ত কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া অনেক কিছু বিষয় বলিলেন। গিরিশ বাবুও যোগ দিয়া বলিলেন, "গনৎকার বড় বিচক্ষণ, যখন এ সব কথা বলেছেন তখন নিশ্চয়ই মিলে যাবে, তবে এখন তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।" ঘরে আরো অনেকেই ছিলেন, সকলেই দোমনা হইয়া এই কথাই কহিতে লাগিলেন। তারপর সকলেই আপন আপন ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা এ বিষয়ে একটু পারদর্শী ছিলেন তাঁহারা কিরূপ লক্ষণকে যব, ধান ইত্যাদি বলে, তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। কষ্টকল্পনা করিয়া উপস্থিত সকলের একটি বা দুইটি শুভ লক্ষণ দেখা গেল কিন্তু চার-চারটি শুভ লক্ষণ কাহারও দেখা গেল না। তখন সকলেই অনির্দ্দিষ্ট গনৎকারের কথা শুনিয়া হর্ষিত ও সন্দিগ্ধ মনে নানা ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন।

শরৎ মহারাজকে হোঁৎকা নাম দেওয়া

নরেন্দ্রনাথ শরৎ মহারাজের নাম রাখিয়াছিলেন হোঁৎকা, কারণ তাঁহার বুদ্ধিটা কিছু মোটা রকমের ছিল এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে আদর করিয়াই হোঁৎকা নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু

এই কয়েক বৎসর তীব্র বৈরাগ্য ও সাধন ভজনে শরৎ মহারাজের অন্য এক মন হইয়া গিয়াছিল। প্রাণভ'রে ভগবানকে ডাকিতেন, ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল। এই সময়ে কাতর ভাবে তিনি এই গানটি গাহিতেন ঃ

"তোমারে করেছি জীবণেরই ধ্রুব-তারা" ইত্যাদি।

"মন চল নিজ নিকেতনে" গানটিও তিনি বরাহনগর মঠে প্রায়ই গাহিতেন।

বরাহনগর মঠে সেবার ভাব

শরৎ মহারাজের যে সেবা করিবার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল তাহা বরাহনগর মঠে প্রথম উদ্ভূত হয়। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে কি করিয়া গুরু-ভাইদিগকে সেবা করা যায়, এইটাই ছিল বরাহনগর মঠের প্রধান শিক্ষা। সকলেই তখন অল্প বয়স্ক বালক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে পারে নাই, ইহাতে মনে একটা বড় রকম দুঃখ থাকিয়া গিয়াছিল। গুরুভাইদিগকে সেবা করিতে পারিলে সে আক্ষেপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইবে, এইজন্য পরস্পরকে নানা ভাবে সেবা করিতে লাগিল। ভাঙ্গা বাড়ীর উত্তর দিকে একটা পুকুর ছিল, যাইবার পথটা অতি ভীষণ। অন্ধকার সিঁড়ি, তাতে ইট-পাটকেল ছড়ানো, সাপ-খোপেরও ভয় আছে; এই রকম একটা সিঁড়ি, গলি বা সরু পথ পার হইতে হইত। সিঁড়ি পার হইয়া অনেকটা যাইলে তবে পুকুর পাওয়া যাইত।

পুকুরের ঘাট বা নামিবার কোন পৈঠা ছিল না। কতকগুলো আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ ধাপ, সেই ধাপ দিয়া নামিয়া কেউ বা একটা কেউ বা দুইটা বালতি লইয়া সেই পুকুর হইতে জল তুলিয়া, অন্ধকারে ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া জল উপরে আনিত। যদি একজন জল আনিবার উপক্রম করিতেছে, আর একজন অমনি তার হাত হইতে বালতি কাড়িয়া লইয়া অতি বিনীতভাবে জল আনিতে যাইত। তখন পরস্পরের সেবা করাই যেন একটা সাধনা। অতগুলি লোক জল খরচ করিবে, ফেলিবার জল বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু পরস্পরের এমন একটা ভালবাসা ছিল, যেন জল তোলা একটা সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম অবস্থায় রাঁধিবার লোক ছিল না। চাকর রাখাও নিষিদ্ধ ছিল। কারণ সকলে একমতে স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীই হইয়াছি তখন চাকর মনিব সম্পর্কে আর কাজ কি! এইজন্য ভাতের হাণ্ডা ও রাঁধিবার কড়া নিজেরাই মাজিত এবং বাসন মাজিতে মাজিতে নানা সৎচর্চ্চা চলিত। গুরুভাইদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইলে সন্তুষ্ট হয় এইজন্য অতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইত। বরাহনগরের মঠ একটা আদর্শ ভালবাসার স্থল ও কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সকলেই যেন এক মন এক প্রাণ এবং পরস্পর পরস্পরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে করিত এবং তদ্রূপই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ভিতর বাহির, ছোট ও বড় কিছুই ছিল না; আদেশও ছিল না, নিষেধও

ছিল না। বরাহনগর মঠ যেন জগৎ হইতে এক পৃথক, স্বতন্ত্র স্থান। ঐ ভাঙ্গা বাড়ীতে সকলেই যেন এক দেবভূমিতে বাস করিতেন। এই সেবা ভাবটা শরৎ মহারাজের প্রাণে বিশেষভাবে লাগিয়াছিল, এইজন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি সেবার এত পক্ষপাতী ছিলেন।

সঙ্গীত

ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া আনে, এবং সেই চাল সিদ্ধ করিয়া একটা কাপড়ে ঢালিয়া নুন লঙ্কার ঝোল বা তেলাকুচার ঝোল দিয়া খাইয়া থাকে, সেই কারণে শরীরটা বড় কৃশ হইয়া গেল এবং অনেক সময় মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। এই সকল অন্তরায় দূরীকরণার্থ বৈরাগ্যমূলক অনেক সঙ্গীত হইতে লাগিল। শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের নিকট মোটামুটি গাহিতে শিখিয়াছিলেন, তিনিও গানে যোগ দিতেন। অনেক গানই হইত, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া এই কয়েকটি গানের উল্লেখ করিতেছি, যথা—

১। "মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে কেন ভ্রম অকারণে।"

২। "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘু রাই।"

৩। "জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।"

৪। "আমায় দে মা পাগল ক'রে, কাজ নেই আর জ্ঞান বিচারে।"

৫। "গগনেরই থালে রবি, চন্দ্র, দীপক জ্বলে।"

৬। "রাধা বই কেউ নাইকো আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী।"

৭। "যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি।"

৮। "উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময় হে।"

৯। "ম্যায় গুলাম, ম্যায় গুলাম, ম্যায় গুলাম তেরি।"

১০। "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।"

গিরিশ বাবু এই সময়ে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া সার এডউইন আর্নল্ড-এর "Light of Asia" বইখানা "বুদ্ধ-চরিত" নাম দিয়া নাটকে পরিণত করেন। ঐ পুস্তকে একটি বৈরাগ্যমূলক গান দিয়াছিলেন, "জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।" ঐ গানটিও হইত। মোটামুটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, শিবের স্তব, শ্যামা-বিষয়ক পদ এবং গিরিশ বাবুর "বুদ্ধদেব-চরিত" "চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকের সঙ্গীত সকলেই অল্প বিস্তর গাহিতেন। বৈরাগ্যই তখন একমাত্র মূল উদ্দেশ্য ছিল। সংসার হইতে কি করিয়া মনটা পৃথক করিয়া ঊর্ধ্বদিকে ঈশ্বর-সকাশে লইয়া যাইতে পারা যায়, ইহাই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সংসারের কোন চিন্তা বা কোন সম্পর্ক যেন একেবারেই কাছে আসিতে না পারে। এই সকলই উগ্র তপস্যার চিহ্ন। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন পথ হইতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য সকলের একই ছিল।

সঙ্গীত-চর্চ্চায় মন যে উচ্চ দিকে যায় এবং ইহা ঈশ্বরো-

পলব্ধির উপায়, সকলেই তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। এক একদিন সঙ্গীত বা ভজন এমন মজিয়া যাইত যে, আহারের জন্য কোন হুঁস থাকিত না, সকলেই তন্ময় হইয়া থাকিত। নরেন্দ্রনাথ এক একদিন তানপুরা লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, তাহাতে সকলেই বিভোর হইয়া যাইতেন। কখনও বা শিবানন্দস্বামী কখনও শরৎ মহারাজ নিজের নিজের খেয়াল মত বেশ গাহিতেন। যাহা হউক, ভজন যে সাধনার একটা অঙ্গ ইহা বেশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

হাসিকৌতুক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অতিশয় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি কৌতুকছলে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা বলিতেন। কোনও বিষয়ে কেউ যদি গোঁড়ামি বা একঘেয়ে ভাব দেখাইত তাহা হইলে তিনি এমন একটি কৌতুকপূর্ণ গল্প বলিতেন যে, তাহা হইতে যে প্রতিপক্ষ কেবলমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া যাইত তাহা নহে, সকলেই একটা উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাইতেন। গোঁড়ামি বা একঘেয়ে ভাব তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কারণ তিনি স্বয়ং অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ভাষা গ্রাম্য ছিল বলিয়া তাঁহার কৌতুকরহস্য অধিকতর প্রীতিকর হইত।

নরেন্দ্রনাথের কৌতুকরহস্য স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিছুই বলিতেন না এবং এই কৌতুক করিবার

ক্ষমতা নরেন্দ্রনাথের বংশের ভিতর একটা স্বাভাবিক গুণ বলিয়া পরিচিত। নরেন্দ্রনাথ প্রায় বলিতেন, "যে লোক বেশী কৌতুক করিতে পারে না, তাহার মাথা খোলে না। উচ্চ অঙ্গের ধীশক্তির পরিচয় হইতেছে যে, যে ব্যক্তি হাসিকৌতুক করিতে পারে।" কৌতুকের অর্থ হইতেছে যে, এক ব্যক্তি একটা ভাব আত্ম-পক্ষ হইতে দেখাইয়াছে, কিন্তু সেই ভাব দেখাইবার কালে তাহার কিছু ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্য হইয়াছে। কৌতুকপ্রিয় লোক সে ত্রুটি অবিলম্বে বুঝিয়া লন এবং সেই ত্রুটি উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্ব ভাবটি বিপর্য্যস্তভাবে দেখাইয়া দেন। এইজন্য ইহাতে উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তির প্রাখর্য্য বিশেষ লক্ষিত হয়। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "যে বেশী কৌতুক করিতে জানে না, তাহার মাথা খোলে না।" নরেন্দ্রনাথ হাসিকৌতুক করিয়া সকলের বিষন্ন ভাব দূর করিতেন, ইহাতে সকলে উত্তেজিত হইয়া নব শক্তিতে আবার সাধন ভজন করিতেন। এই সময় বিষন্ন হইবার বিশেষ কারণ ছিল। অনশন ও শারীরিক ক্লেশে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িতেন। শরৎ মহারাজও বেশ কৌতুক করিতে পারিতেন এবং মাঝে মাঝে সকলকে হাসাইতেন। হাসিতামাসা ও ভজনগান করা বরাহ-নগর মঠের একটা অঙ্গ হইয়াছিল।

কৌপীন প'রে থাকা

বরাহনগর মঠ-স্থাপনের কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ দ্বিতীয়

বৎসরের বর্ষাকালেতে সকলের ভিতর বৈরাগ্যভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিষ গ্রহণ করিবেন না, সকলেই এইরূপ স্থির করিলেন। ভদ্রলোকের ছেলে প্রথম পায়ের জুতা ত্যাগ করিলেন। খালি পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া সকলের পায়ের গোড়ালি ফাটিয়া গেল। একদিন আমি রামতনু বোসের গলির বাটীতে শিবানন্দ স্বামীর পায়ের গোড়ালিতে নারিকেল তৈল লাগাইয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে ফাটাগুলি জুড়িয়া যায়। সকলেই গঙ্গায় গিয়া ডুব দিয়া আসিতেন, গামছা কাহারও ছিল না বা স্নানের সময় গা ঘসিতে ভুলিয়া যাইতেন, এইজন্য গায়ে সর্ব্বদা ময়লা থাকিত। তারপর সকলেরই বহির্বাস ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু তখন সকলের এরূপ তীব্র বৈরাগ্য যে, বহির্বাস পরা ছাড়িয়া দিলেন এবং কৌপীন-মাত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তুইখানি মাত্র বহির্বাস রহিল, কার্য্যোপলক্ষে যাঁহাদের বাহিরে যাইতে হইত কেবল তাঁহারাই বহির্বাস পরিয়া বাহিরে যাইতেন। শেষে কৌপীনও ছিঁড়িয়া গেল, বৈরাগ্য অতি প্রচণ্ড, অনেকেই স্থির করিলেন—যাকগে আর কৌপীনেরও আবশ্যক নাই। অনেকেই তখন দিগম্বর অবস্থায় রহিলেন। কেবল বাহিরে যাইবার সময় সেই তুইখানি বহির্বাস জড়াইতেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহা পুনরায় তুলিয়া রাখিতেন। বর্ষাকাল, একদিন বিকেলে বেলা গিয়াছি, দিগম্বর অবস্থা দেখিয়া আমার ঘৃণা ও লজ্জা হইতে লাগিল। যাহার সহিত কথা কহিতে যাই, তিনিই দিগম্বর। সঙ্কোচের

ভাব কাহারও মধ্যে নাই। যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ বা জপ করিতেছে, কেউ বা অন্য কার্য্য করিতেছে। তারপর বাহিরের ছোট ঘরটিতে গিয়া দেখি, লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন এক দিগম্বর। আমি কাছে গিয়া বসিলাম তাহাতে তাঁহার কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধাভাব নাই, যেন স্বাভাবিক অবস্থায় রহিলেন। এমন সময় সুরেশ মিত্র আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ বড় ঘর থেকে একটা বহির্বাস আনিয়া দিতে ইসারা করিলেন। সুরেশ মিত্র নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী ও বয়োজ্যেষ্ঠ এইজন্য নরেন্দ্রনাথ বহির্বাসটা শুইয়া শুইয়াই কোমরে চাপা দিয়া দিলেন। কিন্তু নিরঞ্জন মহারাজ, শশী মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী সকলেই দিগম্বর হইয়া রহিলেন। সুরেশ মিত্র কৌতুক-প্রিয় লোক, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে, সব শালাই পরমহংস হইল যে!" এই বলিয়া নানারূপ হাসি ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। সাধনায় আছে "দিগম্বরের বা চিদম্বরের।" এইটা অনেক সাধনার বিষয় বলিয়া সকলেই অভ্যাস করিয়াছিলেন। যা হো'ক, কয়েক মাস পরে পুনরায় সকলেই কৌপীন ও বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন।

তখনকার প্রণাম করিবার প্রথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রণাম করিবার প্রথা একেববারেই উঠিয়া গিয়াছিল। তখনকার সমাজটা না বাঙ্গালী, না ফিরিঙ্গী, না হিন্দু। দু' হাত তুলিয়া

প্রণাম করাকে অসভ্যতা বা কুসংস্কার বলা হইত। প্রণাম ত কেহ করিত না, যদি বা করিত, সে কেবল ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলিয়া বা Good morning, Good evening বলিয়া করমর্দ্দন। সেটা একটা কিম্ভূত-কিমাকার সময়। আমাদের বাল্যজীবনটা বাংলা দেশে ভাঁটার মত হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই সময় পুরাতন বাংলা শেষ হইয়া যাইতেছিল, একেবারে কাদা পাঁক জমিয়াছিল এবং নূতন বাংলা আসিবার উপক্রম করিতেছিল, ঠিক এই দু'য়ের মধ্যস্থলে আমাদের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। আচার, ব্যবহার, চাল-চলন, সমস্তই কিম্ভূত-কিমাকার ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকেই হাতজোড় করিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন। এইরূপে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু ইঁহারা অতি অল্প সংখ্যক ছিলেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে এইভাবে প্রণাম করিতেন। এই হইল প্রণাম-পদ্ধতি আনয়নের প্রথম স্রোত, অর্থাৎ 'অপ্রণাম' হইতে 'প্রণাম' পদ্ধতিতে আনয়নের প্রথম চেষ্টা। সুরেশ বাবু বরাহনগর মঠে এক প্রথা প্রণয়ন করিলেন। তিনি সকলকেই বলিতেন "পাও লাগে" অর্থাৎ পাদস্পর্শ করি। পাঞ্জাবে শুদ্ধ ভক্তদিগের মধ্যে প্রণামের প্রথা হইতেছে. "পাও লাগে মহারাজ, মাথা টেক্‌না মহারাজ," অর্থাৎ আমি আপনার পাদস্পর্শ করি এবং আপন-মস্তক চরণে প্রণত

করি। যাহা হউক, "পাও লাগে" অভিবাদন অনেকদিন চলিয়াছিল।

স্ত্রীলোক আসা নিষেধ

বরাহনগর মঠেতে কোন স্ত্রীলোক আসা একেবারেই নিষেধ ছিল। কারণ যুবক সন্ন্যাসীরা একাগ্র মনে সাধন-ভজন করিতেন এবং অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌপীন ধারণ করিয়া বা দিগম্বর অবস্থায় থাকিতেন। স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সাধন-ভজন ছাড়া ঘরসংসারের কথা কহিয়া ফেলে তজ্জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্ন্যাসীরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক যেন আসিতে না পারে। কারণ বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা আসিলে নানা প্রকার অন্য গল্প করিয়া থাকে, তাহাতে সাধন-ভজনের অন্তরায় হয়। স্ত্রীলোকদের স্বভাবই হইতেছে যত্ন ও আত্মীয়-তার কথা কহা। আহারাদির কি হইল, ইত্যাদি কথা উঠিলে সাধন-ভজনের অন্তরায় হইতে পারে। কারণ কঠোরতা, স্ত্রীলোকেরা আদৌ সহ্য করিতে পারে না। নরম ও স্নেহপূর্ণ ভাব তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপ বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য হইবে না স্থির করিয়া স্ত্রীলোক, এমন কি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত আসা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যবশতঃ যদি কোন বৃদ্ধা আসিতেন তাহা হইলে সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেন; কারণ কৌপীনের উপর একটা বহির্বাস পরিতে হইবে এবং একটু আবৃত অবস্থায় থাকিতে হইবে। কোন

স্ত্রীলোক আসিতে দেখিলেই একজন চীৎকার করিয়া উঠিত, "Mogis are coming." পাছে মাগী কথাটা কেহ বুঝিয়া ফেলে সেইজন্য সেটাকে পরিমার্জ্জিত করিয়া Mogis করা হইল এবং সেটারও ঊর্ধ্বগতি হইয়া Burmese হইয়া গেল। কারণ মগরাই হচ্ছে বর্ম্মী। Burmese are coming, মানে হচ্ছে স্ত্রীলোকেরা আসিতেছে। এটা হইল একটা সাঙ্কেতিক শব্দ।

কথক

একটি লোক ভাগবতের কথকতা করিত। লোকটাকে নরেন্দ্রনাথ পছন্দ করিতেন, কারণ কাছে আসিলেই নরেন্দ্রনাথ হাসিতামাসা করিতেন। তাহাকে একটি ইংরাজী নাম দেওয়া হইয়াছিল 'Somewhat' এবং সকলেই তাহাকে 'Somewhat' বলিয়া ডাকিত।

বলরামবাবুর চাকর

এস্থলে ঘটনাটি অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দেওয়া হইল। নীরস জীবনের ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু আনুষঙ্গিক বিষয় জানা থাকিলে ঘটনাসমূহ বুঝিতে একটু সরল হয়।

বলরাম বাবুর 'যত্না' ব'লে এক উড়ে চাকর ছিল। সেটা যেমন চোর তেমনি পাজি। সেটা ছিল সর্ব্বগুণের গুণমণি। সকলেই তার ওপর বিরক্ত ছিল, বিশেষ করিয়া যোগেন মহারাজ। সেটাকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য যোগেন মহারাজ বলরাম বাবুকে বিশেষ করিয়া বলিতেন। একদিন বলরাম

বাবু বলিলেন, "ও যোগেন, চাকরবাকর ছোটলোক, ওরা চুরি করিয়াই থাকে। তা ছাড়া ওকে বিদেয় ক'রে দিলে ও কোথায় যাবে? এমন কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী চাকর কোথায় পাই বল যে, কাজও করিবে চুরিও করিবে না।" বলরাম বাবু কৌতুক করিয়া বলিতেন যে, বলরাম বাবুকে এক কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী চাকর এনে দিতে হবে। এই নিয়ে দিন কতক খুব আমোদ চলেছিল।

আলমবাজার মঠ

বরাহনগরের মঠের পরে আলমবাজারের মঠ হয়। বরাহ-নগরের মঠের শেষ ভাগে, অর্থাৎ ১৮৯১ সালে কালীকৃষ্ণ মহারাজ অর্থাৎ বিরজানন্দ স্বামী বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং শরৎ মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিবার জন্য উভয়ে জয়রামবাটীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে উভয়ে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং যে ঘরটি ঠাকুরঘর বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল সেই ঘরটিতে উভয়ে শুইয়া রহিলেন। আলমবাজার মঠে প্রথম দুই তিন সপ্তাহ শশী মহারাজের ঘর বলিয়া যাহা পরিচিত হইয়াছিল তথায় ঠাকুরঘর করা হইয়াছিল। তাহার চারিদিকে রেড়ীর তেলের কারখানা ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরটিতে সর্ব্বদা রেড়ীর তেলের গন্ধ আসিত বলিয়া এ ঘরটি পরিত্যাগ করিয়া মাঝের ঘরে পরে ঠাকুরের দ্রব্য আনা হইয়াছিল।

চা ক'রে খাওয়ান

শরৎ মহারাজের ও কালীকৃষ্ণ মহারাজের খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। ঘরের মেঝেতে দুইজনে কম্বল মুড়ি দিয়া হিহি করিয়া কাঁপিতেছিলেন। তখন শীত পড়িয়াছে। বর্ত্তমান লেখক বেলা ৫টার সময়, প্রথম দিন আলমবাজার মঠে যাইলেন। সাত-আট দিন হইল, বরাহনগর হইতে আলমবাজারে মঠ উঠিয়া আসিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া বর্ত্তমান লেখক, শরৎ মহারাজ ও কালীকৃষ্ণ মহারাজের নিকট বসিলেন। শরৎ মহারাজের তখন জ্বর সবেমাত্র ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে। নূতন বাড়ী, সব দিক জানাশুনা নাই, অন্ধকার হইয়া অসিতেছে, আলোর কোন বন্দোবস্ত নাই, সবই অনিশ্চিত। হঠাৎ শরৎ মহারাজের মনে কি এক ভাব হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। জ্বরটা সবে ছাড়ছে, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, হাত-পা ঠিক রাখিতে পারিতেছিলেন না, তখনও সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। অতি করুণ ও কাতর স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাই, তোমাকে একটু চা ক'রে খাওয়াব। তুমি চা বড় ভালবাস, তোমায় একটু চা ক'রে খাওয়াব।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন,—"আরে কি কর! জ্বরে কাঁপছো, পা টল্‌ছে, পড়ে যাবে যে! চা না হয় উনুন ধরলে হবে।" শরৎ মহারাজের মনে তখন কি ভাব উঠেছিল তিনিই জানেন; চা খাওয়াইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন, "না ভাই, তোমায় একটু চা ক'রে খাওয়াব; আমার প্রাণটা কেমন ক'চ্ছে। আমার বড় ইচ্ছা

ক'চ্ছে তোমায় একটু চা ক'রে খাওয়াব।" তিনি এমন ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন যে, সেখানে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করা চলে না। অগত্যা বর্ত্তমান লেখক নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। শীতের বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শরৎ মহারাজের সারাদিন জ্বরে ভুগে হাত-পা কাঁপছে, সন্ধ্যার সময় অন্ধকার, তবুও তিনি দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন এবং রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটা কেরোসিন তেলের ডিবে জ্বালিয়া আলো করিলেন। ঘুঁটে, কয়লা, জোগাড় করিয়া উনানটা জ্বালালেন। তিনি নিজেই সব করিলেন, বর্ত্তমান লেখককে কিছুই করিতে দিলেন না। আগুনটা জ্বললে একটা বড় কেটলি ক'রে জল চাপিয়ে দিলেন। পরে জলটা যখন খুব টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো তখন নিজেই সেই কেটলিটা ডান হাতে নিয়ে আবার কাঁপতে কাঁপতে উপরে এলেন। দেওয়ালটা ডান হাতের কাছে পড়েছিল, আবার ডান হাতেই জলের কেটলি, অগত্যা বাঁ-হাতে দেওয়াল ধরিয়া এক পা এক পা করিয়া বাহিরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় আসিলেন। বর্ত্তমান লেখক অতি কাতরভাবে তাঁর ডান হাত হইতে কেটলিটি লইবার চেষ্টা করিলেন। কারণ তিনি অতি কষ্টে আসিতেছিলেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ অতি কাতরস্বরে ও কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "না ভাই, তুমি কেটলি নিও না, আমি তোমায় নিজে হাতে ক'রে চা খাওয়াব।" জোর করিয়া লইতে গেলে পাছে গরম জল গায়ে পড়ে এই ভয়ে

বর্ত্তমান লেখক পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ উত্তর দিকের বড় হল ঘরটিতে গিয়া একটি সিঁড়ির নীচের ছোট কুটুরীর মত স্থান হইতে ছুটো চায়ের বাটি ও কালো রংয়ের টী-পট আনিলেন এবং টী-পটে চা দিয়া গরম জল ঢালিলেন। চা তৈরী হইলে বাটিতে ঢালিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিপূর্ণ মুখে বর্ত্তমান লেখককে খাওয়াইলেন। বর্ত্তমান লেখককে নিজে চা ঢালিয়া খাওয়াইয়া পরে নিজের বাটিতে চা ঢালিয়া খাইলেন। শরৎ মহারাজের সেদিন কি একটা ভাব এসেছিল তা বলা যায় না। সেদিন যেন তিনি দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা, চোখমুখের ভাব, গলার স্বর, ভাবভঙ্গী সমস্তই যেন একটা উচ্চ অবস্থার চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছিল।

রাত্রে ক্রন্দন

আলমবাজার মঠের প্রথম সময়েই, একদিন গরমকালে বৈকালে শরৎ মহারাজ বলিলেন যে, তিনি কিছুই আহার করিবেন না। রাত্রিটা উপবাস করিয়া থাকিবেন। বাহিরের দিকের বড় ঘরের সামনের বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া তিনি পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইলেন, বর্ত্তমান লেখক সেই বালিশের অপর পার্শ্বে মাথা দিয়া শুইয়া রহিলেন। গরমকালে একটু একটু হাওয়া চলিতেছে। বর্ত্তমান লেখকের আধা নিদ্রা হইয়াছে, রাত্রিটা তখন একটু অন্ধকার ছিল। রাত্রি এগার

বা সাড়ে এগারটার সময় শরৎ মহারাজ পশ্চিম দিকের দেওয়ালের জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। চাঁদ উঠিল—চাঁদের আলো মুখে ও বুকে পড়িল। নিকটস্থ শায়িত ব্যক্তির আর ঘুম হইল না; তিনি স্থির হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন :

"যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবা নিশি আসা পথ নিরখিয়ে।"

প্রথমে অতি মৃদু স্বরে তিনি এই গানটি গাহিতে লাগিলেন। ক্রমেই স্বর বাড়িতে লাগিল এবং শেষে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। অনবরত তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মোটা মানুষ—বুক ভাসিয়া গিয়া পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গেল। চাঁদের আলো পড়াতে তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। এমন সকরুণ স্বরে কাতর প্রাণে গাহিতে লাগিলেন যে, শায়িত শ্রোতার বুকের ভিতর কষ্ট হইতে লাগিল। তখন শরৎ মহারাজ ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন, দিগ্বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই। ভজনের অপর লাইনগুলি তিনি গাহিতে পারিতেছিলেন না, কেবলমাত্র চারিটি পঙক্তি অনবরত উচ্চারণ করিতেছেন ও হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে যেন ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্তুতি করিতেছেন। এই সময়ে শরৎ মহারাজের বড় একটা বিষাদের

ভাব আসিয়াছিল। তিনি সকল কার্য্য ও কথাবার্ত্তাতে,—আর ত কিছু হ'লো না, কিছুই ত পেলুম না, দেহটা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, এই ভাব প্রকাশ করিতেন।

৺কালীপূজার দিন রাত্রিতে ক্রন্দন

শরৎ মহারাজের এইরূপ ভাব আরও একবার দেখা গিয়াছিল। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর প্রথম অমাবস্যায় যখন বেলুড় মঠে ৺কালীপূজা হইয়াছিল তখন একবার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ রাত্রি দু'টা বা তিনটার সময় উপরকার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের পর তিনি নিজের মাথা মা কালীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি এমন করুণস্বরে ও কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে এক এক জনের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার মাথা মা কালীর চরণে সমর্পণ করিতেছিলেন যে, সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের এইরূপ ভাব দেখিয়া অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই মনে মনে মা কালীর কাছে মস্তক পূর্ণাহুতি দিতে লাগিলেন। তারপর বৃদ্ধ নিত্যানন্দ স্বামী উপরে যাইয়া শরৎ মহারাজকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিলেন। এরূপ মাতোয়ারা ভাব, ধীর শান্ত শরৎ মহারাজের পক্ষে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সবিকল্প সমাধি

স্বামিজীর তিরোভাবের পর প্রথম বৎসর যে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয় তাহাতে জনসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। প্রথম বারে সমস্ত মঠটিতে লোক ভোজন করিতে বসিয়াছিল কিন্তু প্রায় ততজন লোক খাইতে অবশিষ্ট রহিল। অভুক্ত লোক-দিগের আহারের স্থান করিবার জন্য শরৎ মহারাজ, বিরজানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক ঝাড়ু ও বালতি হাতে লইয়া মাঠ পরিষ্কার করিতে বাহির হইলেন। যদিও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অপরকে আদেশ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া তিন জনেই কাজ শুরু করিলেন: বেলুড় মঠের দক্ষিণ দিকের মাঠের ধারে যে রকটি আছে তাহার অনতিদূরে একটি বাঁশের বেড়া ছিল। উৎসবের দিন বাঁশের বেড়াটি তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। সেই স্থান হইতে কয়েক পদ দক্ষিণ দিকে গিয়া দরিদ্রনারায়ণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি তিন জনে বালতিতে ফেলিতে লাগিলেন। শাল-পাতে ভাত, কড়ায়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, আলু দিয়ে মাছের দম আর দধি এবং বোঁদে এই কটা এক সঙ্গে মিশে একটা কদর্য্য আকার ধ'রে রয়েছে। শরৎ মহারাজ তিন জনের মধ্য হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ডান ধারের ও বাঁ ধারের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি হইতে কিছু কিছু সর্ব্ব মিশ্রিত অন্ন উঠাইয়া লইলেন এবং বাঁ হাতে চেটোয় রাখিয়া ডান হাতের তিনটি অঙ্গুলী দিয়া মিশাইরা লইয়া অন্নগুলি মুখে দিয়া মাথায় হাত মুছিলেন এবং অতি ভক্তিপূর্ণ মৃদুস্বরে

বলিতে লাগিলেন 'উনসত্তিক জাতের প্রসাদ—মহা প্রসাদ', বার তিনেক কথাটা বলিয়াই শরৎ মহারাজ স্থির নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত, বাহুদ্বয় নিস্পন্দ, সমস্ত শরীরই স্থির। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং আবার কাজ করিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি গাছ, পাতা, ফুল, ঘাস, মানুষ, আকাশ, জল সমস্তই ব্রহ্মময় দেখিতেছিলেন। সবই এক, মাত্র রূপ ধরিয়াছে ; বহু—সবই এক। কি স্নিগ্ধ গম্ভীর তখন তাঁহার মুখের ভাব হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। কয়েকদিন পরে ঐ কথা উল্লেখ করায় শরৎ মহারাজ অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ও সব কিছু নয়, ও সব কিছু নয়।" এই বলিয়া তিনি কথাটা চাপা দিলেন এবং আপনার ভাব গোপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় যেন তাঁহার চক্ষের ভিতর দিয়া আবার সেই ভাবটি ফুটিতে লাগিল।

কালীবেদান্তীর সেবা

অভেদানন্দ স্বামীর (কালীবেদান্তী) পায়ের অসুখের সময় শরৎ মহারাজ প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি অপরকে বলিতেন যে, এই পীড়ার বীজ অন্যের গায়ে লাগিলে তাহারও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য তিনি ক্ষত স্থান ধোয়াইবার সময় অন্য কাহাকেও নিকটে যাইতে দিতেন না। শরৎ মহারাজ নিজের প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া

রোগীর সমস্ত কার্য্য করিতেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস তিনি সেবা করিয়াছিলেন। তখন রোগীর চিকিৎসাই তাঁহার জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন হইয়া উঠিয়াছিল। কি স্নেহপূর্ণ ভাবে, কি যত্নে, কি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাইয়া শরৎ মহারাজ কালীবেদান্তীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়। রামকৃষ্ণমিশনে যে সেবা-ভাব প্রচলিত হইয়াছে ইহা শরৎ মহারাজ তাঁহার জীবনে দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ শরৎ মহারাজের পাহাড় হইতে ফিরিয়া বরাহনগর মঠে আসা হইতে ১৮৯৬ সালের মার্চ্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা পর্য্যন্ত, (এই সময় যদিও সাধারণে অজানা) এই সময়েই শরৎ মহারাজ যথার্থ সাধন, ভজন ও তপস্যা করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই দেব-ভাবে তিনি পরিপূর্ণ থাকিতেন এবং মনও উচ্চ স্তরে থাকিত। ভালবাসা দিয়া আকর্ষণ-শক্তি তাঁহার খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেক লোক শরৎ মহারাজের নিকট থাকিতে ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে ইচ্ছা করিতেন। সাধনভজন বিষয়ে এই সময়টি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

কালীবেদান্তীর পা'টি সর্ব্বদা প্রশস্ত করিয়া একভাবে রাখায় পায়ের মাংসপেশীসকল ক্ষীণ হইয়া গেল। যদিও পীড়া আরোগ্য হইল, চলিবার ক্ষমতা রহিল না। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিল যে, যে কোন রকম উপায় করিয়া রোগীকে একটু করিয়া চলান আবশ্যক, তাহা না হইলে পা খানা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। একদিন বৈকালে চারিটার সময় শরৎ মহারাজ

কালীবেদান্তীকে খুব আদর করিয়া হাতে একটি লাঠি দিয়া ধরিয়া ধরিয়া বাহিরের সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া নীচের উঠানে লইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ সঙ্গে করিয়া খুব আদর করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ শরৎ মহারাজ উপরে দৌড়াইয়া চলিয়া আসিয়া কালীবেদান্তীকে একলা উপরে আসিতে বলিলেন। কালীবেদান্তী নিজেকে অসমর্থ ও চলৎশক্তি-বিহীন মনে করিয়া কাকুতিমিনতি ও রোদন করিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বড় ঘরের সামনের বারান্দা থেকে কালীবেদান্তীকে নির্ম্মমভাবে অতি কঠোর বচনে গালি দিতে লাগিলেন। কালীবেদান্তী প্রথমে নীচে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিল না দেখিয়া শেষে ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। শরৎ মহারাজ, সান্যাল মহাশয়, তুলসী মহারাজ ও শশী মহারাজ তাহাতে খুব হাসিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ তখন আবার স্নেহপূর্ণভাবে বলিতে লাগিলেন, "কালু ভাই, রাগ করিস নি। তোর ভালর জন্যই আমি এ কাজ করেছি। ডাক্তারেরা এরূপ ক'রতে বলে গেছে, আমার কোন দোষ নেই ভাই।" তারপর থেকে কালী-বেদান্তী লাঠি লইয়া নিজেই চলিতে লাগিলেন।

গিরিশ বাবুর সহিত উৎসবের কথাবার্ত্তা

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিনেশ্বরে উৎসব হইবে। বলরাম বাবুর

বাটীতে উৎসবের ফর্দ্দাফর্দ্দির সভা বসিত। একদিন সকাল ৯।১০ টার সময় বলরাম বাবুর বাটীতে গিরিশ বাবু আসিলেন, কিছুক্ষণ উৎসবের কথা শুনিয়া গিরিশ বাবু বলিলেন, "দেখ শরৎ, আমি একটা কথা বলি। উৎসবে অনেক গণ্যমান্য বড় লোক যাবে, তাহাদের জন্য প্রসাদের আলাদা বন্দোবস্ত ক'রলে হয় না? তাহারা সমাজে একটা মান্য পেয়ে থাকে, তাই প্রসাদের একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত নয় কি?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এত ভিড়ে দু'রকম বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। সে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আর সামাজিকতার কথা যা বল্লেন. এখানে সে রকম কিছু হবে না। কারণ এ যে প্রসাদ পাওয়া, এখানে সকলেই সমান।" গিরিশ বাবু বলিলেন, "তবু তাহারা সমাজে ত একটা মান্য পেয়ে থাকে, এখানেই বা পাবে না কেন?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "এটা তীর্থ-ক্ষেত্র; সমাজে বড় ছোট থাকিতে পারে, মানী অমানী হইতে পারে, কিন্তু তীর্থে সকলেই সমান। শ্রীক্ষেত্রে কেউ কি বড় ছোট বিবেচনা করে? সমাজে বড় ছোটর বিচার হয় হউক। কিন্তু এই মহাতীর্থে বড় ছোটর বিচার উঠে গিয়ে সকলে এক হয়ে যাবে।" গিরিশ বাবু বলিলেন, "এখানে বড় ছোট নেই, সব এক, এ ভাল কথা।" তারপর সে কথা মিটিয়া গেল সকলেই একমত হইলেন। তারপর তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ, আগে আমি আদি-ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম, একদিন একটি পূর্ব্ব দেশীয় লোক আসিয়া বেদীতে বসিয়া

উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে ভগবানের দ্বারের দ্বারপাল বলিলেন এবং তাঁহার হাতে ধর্ম্মদণ্ড আছে, তাহার দ্বারা তিনি গতাগতি নিয়মিত করিতেছেন। বর্ণনাটি বেশ হইয়াছিল তাহাতে কোন দোষ হয় নাই। পরদিন আমি কেশব বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে একটি লোক বলিতে লাগিলেন, 'শুনেছেন মহাশয়, ঐ বাঙ্গালটার কীর্ত্তি! মহর্ষিকে দরোয়ান সাজাইয়া কাঁধে লাঠি দিয়া ভগবানের দেউড়িতে দাঁড় করাইয়া রাখিল। তাঁহার যেন ভগবানের বাটীতে ঢুকিবার অধিকার নাই। ভগবানের সহিত তাঁহার যেন সাক্ষাৎ হয় নাই।' আবার দু'এক জন বলিলেন, 'ওটা বাঙ্গাল, অসভ্য, ওর কি কোন হিতাহিত জ্ঞান আছে, না কথা কহিতে জানে।' এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। ওদেরও ভিতর এত অবজ্ঞাব ভাব! পরস্পরকে এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া কথা কয়। আমি তখন মনে মনে স্থির করিলাম যে, আজ থেকে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলাম। যদি ভগবান স্বয়ং প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া আমায় গ্রহণ করেন তবেই আমি ধর্ম্মকর্ম্মের কথা শুনিব। তার কত বৎসরের পর, তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সহিত দেখা। ভাগ্যিস তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাই আমার মন ফিরলো, বুকে একটা শান্তি এলো, তা না হলে বুকটা জ্বলে যেত।" তারপর উৎসব-সংক্রান্ত নানা বিষয় কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

শরৎ মহারাজ ও বর্ত্তমান লেখক

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। তখন তিনি অতি স্থির ও বালকের মত হইয়াছিলেন। তখন তিনি সর্ব্বদাই এমন কি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জপ, ধ্যান করিতেন এবং অধ্যয়নেও উৎসাহী ছিলেন; অধীত নানা গ্রন্থের কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। কি প্রকারে সকলের মঙ্গল হয়, জীবসমূহের কি প্রকারে মঙ্গল হয়, এই চিন্তা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন এবং এই বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই কথা কহিতেন। কখনও কখনও তিনি প্রাতে বর্ত্তমান লেখকের সহিত বন-হুগলীর সুরম্য রাস্তাটিতে বেড়াইতে যাইতেন, কখনও বা বাগানের ভিতরকার রাস্তাটি দিয়া বরাহনগর পর্য্যন্ত বেড়াইতেন। একদিন প্রাতে Necessities of life এর কথা উঠিল। মানুষ কি পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিলে স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে বিলাসদ্রব্য বলা যাইতে পারে, এবং কোন্ দ্রবকে বিলাসদ্রব্য বলা যাইতে পারে না এই সকল লইয়া নানা কথা চলিল। এ সকল হ'চ্ছে Political economyর কথা। উভয়েই নানা কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। অবশেষে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, জাতি বা সমাজের সভ্যতা, জলবায়ু, স্থান ও অন্যান্য কারণের উপর আবশ্যকীয় বা বিলাস-দ্রব্য নির্ভর করে। শরৎ মহারাজ Political economyর গূঢ়তত্ত্ব লইয়া অনেক আলোচনা করিতেন এবং সকলে তাহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন।

একদিন শরৎ মহারাজ বলিলেন যে, চা-পান বিলাস দ্রব্যের ভিতর, আবশ্যকীয় নহে। উভয়েই চা-খোর। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার নিকট এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শরৎ মহারাজ তখন আসামের চা-বাগানের কুলীদের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন, "চায়ের জলটা কি জান ? আসামে কুলীদের রক্ত। বিলাসের জন্য চা খাচ্ছ না ত কি ? আবশ্যকীয় ব'লে যুক্তি তর্ক নয়। ইহা প্রত্যক্ষ গরীব, নিরাশ্রয় কুলীদের রক্ত।" শরৎ মহারাজ এমন ওজস্বী ও হৃদয়স্পর্শী ভাবে কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিয়া বর্ত্তমান লেখক ব্যথিত হইলেন। তিনি চা বাগানের কুলীদের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে এমন ব্যথিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁর চক্ষে জল আসিল। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন যে, চা বিলাসদ্রব্য হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে আবশ্যকীয় বটে। যদিও বর্ত্তমান লেখক বিশেষ চা-খোর কিন্তু সেই দিবস হইতে চা-পান ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁর চক্ষুর সম্মুখে শরৎ মহারাজের সেই চোখমুখ ও আধআধ কথা ভাসিয়া উঠিত। বর্ত্তমান লেখক চা-খোর, তিনি দশ বারো দিন পরে আবার চা-পান আরম্ভ করিলেন কিন্তু শরৎ মহারাজের সেই দিবসের কথাগুলি আজীবন তাঁহার স্মরণ আছে।

শরৎ মহারাজের কৌতুকরহস্য

কৌতুকরহস্যে শরৎ মহারাজ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

একদিন সকাল বেলা ১১॥০টা ১২টার সময় গঙ্গাস্নান করিয়া মঠের দিকে ফিরিতেছিলাম। এমন সময় একটা ষাঁড় এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইয়া শয়ন করিল। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "এই ষাঁড়টা এই বাটীর হইবে, কারণ ষাঁড়টা এর অভ্যস্ত স্থানে শয়ন করিয়া রহিল।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "ঠিক বলেছ ; এটা হ'ল মাতাল ও গুলিখোরের স্থান নির্ণয়। তবে এক গল্প বলি শোন," বলিয়া তিনি এক গল্প আরম্ভ করিলেন। "দেখ, দুই বন্ধু, একজন মাতাল ও একজন গুলিখোর পথে যাইতে যাইতে এক হালুইকরের দোকানে খাবার কিনিল। হালুইকরের দোকানে তখন টাকা ভাঙ্গানোর পয়সা ছিল না। তখন তাহারা হালুইকরের দোকান হইতে ছয় আনার খাবার কিনিল এবং বাকী দশ আনা পয়সা পরদিন লইবে এইরূপ স্থির করিল। তবে স্থানটা ঠিক নির্ণয় করিয়া যাইতে হইবে। তাহারা দেখিল দোকানের সম্মুখে একটা ষাঁড় শুইয়া আছে এবং সেই ষাঁড়টাকেই তাহারা চিহ্ন করিয়া যাইল। পরদিন নেশা করিয়া পয়সা দশ আনা আদায় করিতে আসিল। ঘটনাচক্রে সেই ষাঁড়টা একটা লম্বা দাড়িওয়ালা দরজীর দোকানের সম্মুখে শুইয়াছিল। উভয়ে যাইয়া তখন সেই দাড়িওয়ালা দরজীকে তম্বিতম্বা করিতে লাগিল এবং দশ আনা পয়সা চাহিল। গুলিখোর বন্ধুটি তম্বিতম্বা করিতে লাগিল ও বলিল, 'কি বাবা, দশ গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্যে একেবারে ভোল ফিরিয়ে বসে আছ। কাল ছিলে হালুইকর আর আজ হলে

দরজী ! আর বাবা রাতারাতি দাড়ি গজিয়ে ফেল্লে। এখনও তার সাক্ষী সাদা ষাঁড় শুয়ে রয়েছে। গুলি খাই ব'লে বাবা মনে ক'রো না, আমার ভুল হ'য়েছে'।" শরৎ মহারাজ গল্পটি এমন অভিনয়ের ভাবে স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া উভয় বন্ধুর কথা বলিতে লাগিলেন যে, বর্ত্তমান লেখকের হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিয়া গেল। অপর সকলেও শরৎ মহারাজের গল্পটি লইয়া নকল করিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

শরৎ মহারাজ গিরিশবাবু-কথিত আর একটি গল্প বলিয়া সকলকে হাসাইতেন। কতকগুলি চাটগেঁয়ে মাঝি যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। গানে সোম,—সকলে একসঙ্গে কি করিয়া তাল দেয় ইহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না, এইজন্য তাহারা তাহাদের সর্দ্দারকে বলিল, "ও কস্তা (কর্ত্তা), ঐ গানটা কেমন অইল (হইল)।" কর্ত্তা বলিল "যে সুমুন্দি চুমচুমাইছে উ সুমুন্দি মজা না মারছে (মন্দিরা বাজান)। যে সুমুন্দি ডেবডেবাইছে (ঢোল বাজান) উ সুমুন্দি মজা না মারছে। যে সুমুন্দি পেনপেনাইছে (তানপুরা) উ সুমুন্দি মজা না মারছে। কদুর ভিতর গাড়ছে মেক (ডাণ্ডা) আর মেকের গায়ে লাগাইছে সিক (তার) আর সব সুমুন্দি গুঞ্জিয়ে লাগাইছে সিক, সিক ধরে মারে টান আর সব সুমুন্দি করে হ্ হ্ হ্ হ।" শরৎ মহারাজ যদিও স্বাভাবিক ধীর গম্ভীর ছিলেন কিন্তু ইচ্ছা করিলে নানারূপ কৌতুক ও ব্যঙ্গ করিয়া

সকলকে খুব হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার এরূপ অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প ছিল।

শরৎ মহারাজের অধ্যয়ন

এই সময়ে তিনি 'সার ওয়ালটার স্কট'এর নভেলগুলি খুব পড়িতেন এবং মাঝে মাঝে "Lady of the Lake" হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। তখন তিনি যেন একটা ভাবরাজ্যে থাকিতেন। সর্ব্বদা বিভোর, সকলকার কাছে বিনয়ী, সকলকার কাছে কৃপাপ্রার্থী। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইবে তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। এই সময়টা তাঁহার জীবন অতি মধুর ও ভালবাসাপূর্ণ হইয়াছিল।

শরৎ মহারাজ ও হরিশ্চন্দ্র

আলমবাজার মঠে বর্ষাকালে বৈকালবেলা অনেক লোক আসিয়াছে। শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন তাই আক্ষেপ করিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানের অনেক কথা বলিতেছিলেন এবং উপস্থিত লোকের ম্যালেরিয়া জ্বর কি প্রকারে নিবারণ করা যায় সেই কথা বলিতেছিলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে, বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া কোন একটা পাহাড়ী স্থানে মঠ স্থাপন করিলে ম্যালেরিয়ার কোন ভয় থাকিবে না। অপরে বলিলেন, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) বাংলা দেশে তপস্যা করিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরের পচা ম্যালেরিয়ায় থাকিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য বাংলা দেশ ত্যাগ করা যাইতে

পারে না। এইরূপ নানা কথা হইতেছে সেই সময় হরিশ, যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট থাকিয়াছিল এবং মাথার গোল হওয়াতে অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিল, চুপ করিয়াছিল। শরৎ মহারাজ হরিশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভাই হরিশ, আর তো এমন করিয়া থাকা যায় না।" সকলে তখন বারবাড়ীর সিঁড়ির সামনে পশ্চিম দিকের দালানে বসিয়াছিলেন এবং পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া রৌদ্র আসিতেছিল। হরিশ ভক্তিভাবে করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "তা-তা-তা ভাই ও রকম করে চল্-ল-ল-লে যদি ব্যামো হয় তবে এমন করে চল্-ল-লে হয় না", এই বলিয়া পদদ্বয় উচ্চে তুলিয়া হস্তদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ, অথবা যাহাকে Peacock march বলে তদ্রূপ করিয়া হরিশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন এক ব্যক্তি তাহার পা দু'টো ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। হরিশ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "কেন? শরৎ এই যে বলিল পায়ে চললে ম্যালেরিয়া হয় তাই আমি হাতে চলছিলাম।" তাহা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিল। বোঝা গেল, হরিশের তখনও অপ্রকৃতিস্থ ভাব আছে।

শরৎ মহারাজের বিড়ালের অভিনয় দেখান

একদিন দুপুর বেলা বর্ত্তমান লেখক গিরিশ বাবুর বাটী

গিয়াছেন। শরৎ মহারাজ সেদিন গিরিশ বাবুর বাটীতে আহার করিয়াছেন। শরৎ মহারাজ সবে আঁচাইয়া ঘরে আসিয়াছেন, এমন সময় বর্ত্তমান লেখককে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ও হে, যদি আর একটু আগে আসতে তা'হলে জি, সির একটা রগড় দেখতে। ভাত বাড়তে একটু দেরী হ'য়েছিল, সেই সময়ে জি, সি, দুটো হুলো বেড়ালে কেমন ক'রে ঝগড়া করে সেইটা দেখাতে লাগলো।" তখন বাহিরে কেহ ছিল না, এই জন্য শরৎ মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে নিজেই গিরিশ বাবুর ঝগড়ার অভিনয় করিতে লাগিলেন। উপুড় হইয়া শুইয়া মুখটা উপরে তুলিয়া ডান হাতে থাবা মারিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে ম্যাও ম্যাও শব্দ করিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং শরৎ মহারাজের অভিনয় হইতেই বুঝা যাইতে পারে যে, গিরিশ বাবুর অভিনয় কত সুন্দর হইয়াছিল।

নবদ্বীপে ভট্টাচার্য্যের কথা

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী একবার নবদ্বীপ দর্শন করিতে যান। সঙ্গে শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ প্রভৃতি ছিলেন। নবদ্বীপে শরৎ মহারাজ শুনিলেন যে, একজন ন্যায়রত্ন বা বিদ্যাবাগীশ খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। শরৎ মহারাজ বিস্মিত হইয়া সেই ন্যায়রত্নের সহিত দেখা করিতে যান। শরৎ মহারাজ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে সেই পণ্ডিতটি

সাদর সম্ভাষণ করিয়া শরৎ মহারাজকে বসাইলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যেমন হইয়া থাকেন তিনি সেই রকম লোক। বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বয়সে প্রবীণ এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ধর্ম্ম-পিপাসু হইয়া কোন শাস্ত্রে শান্তি না পাইয়া অবশেষে যীশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং তদবধি শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে বাইবেল ও অপর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তিনি খুব উদারস্বভাব সাধক ছিলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, নবদ্বীপের পণ্ডিত হইয়া শেষে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। যাহা হউক, ধর্ম্মবিষয়ে খুব উচ্চস্তরের কথা হইতেছিল, এমন সময় জানালার ভিতর হইতে একটা মুরগী বাহির হইয়া ভট্টাচার্য্যের গায়ের উপর দিয়া ঘরের এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া পালক, বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার পর একটি স্ত্রীলোক তাহাকে ধরিবার জন্য এদিক ওদিক ছুটিয়া শেষে ধরিয়া লইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য খানিক গুম্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "ইহাকেই বলে জীবন্ত নরক ভোগ। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, শিব পূজা, নারায়ণ পূজা না করিয়া জল খাই না। দৈব বিপাকে খৃষ্টান হইলাম ও ঐ মুসলমান স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে হইল ও উহার হাতে ভাত খাইতে হইতেছে। মুরগী পুঁথির উপর বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে, ভাতেও মুরগী ঠুকরে যায়। বলিতে যাইলে ঝগড়া

হয়। নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া এই দুর্গতি হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ, এই জন্য করি নাই।” এই সব কথা বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য কাঁদিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা দেখিয়া শরৎ মহারাজ বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া অনেককে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে ভট্টাচার্য্যের দুঃখের কথা ভাবিতেন।

পশুবলি

শরৎ মহারাজ উত্তরাখণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আলমবাজার মঠে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল। একদিন প্রাতে চা পান করিয়া বর্ত্তমান লেখক ও শরৎ মহারাজ আলমবাজার মঠ হইতে পায়চারি করিতে করিতে বরাহনগরের বাজারের দিকে চলিলেন। পথে রাসমঞ্চের কাছে একটি লোক একখানি খাঁড়া শানাইতে-ছিল। বর্ত্তমান লেখক খাঁড়া দেখিয়া বলিলেন, “বলি করা ঠিক নয়।” শরৎ মহারাজ বলিলেন, “কেন, মাংস খেতে পার আর বলি করিলেই দোষ।” বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, “মাংস খাওয়া এক ভাবের, আর ধর্ম্মের নামে জীব হত্যা করা আর এক ভাবের। দয়াই ধর্ম্ম। সকলের প্রতি ভালবাসা হ’চ্ছে ধর্ম্ম। দয়া এবং ভালবাসা যে অনুপাতে বাড়ে ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও সেই অনুপাতে বাড়ে। কিন্তু ধর্ম্মের

নাম নিয়ে একটা জীবের প্রাণনাশ করা উচিত নয়। একটা জীব যখন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যা ব্যা ক'রে চীৎকার ক'চ্ছে তখন লোকের মনে কোথায় ভক্তি থাকে এবং কোথায় ভালবাসা থাকে? মাংস খাওয়া, এ ত শরীরের কার্য্য, এর সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্পর্ক আছে? পশুবধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান আছে, সেইখানে করিলেই ত হয়। ধর্ম্মের নামে অপরের প্রাণনাশ করার কি আবশ্যকতা আছে।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "ধর্ম্মের সহিত বলির সম্পর্ক আছে। শাস্ত্রে বলে, 'দেবার্থে পশুহননম্'। শাস্ত্রে যেরূপ আছে তার খানিকটা ইচ্ছামত বাদ দিলে ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। এই জন্য কোন অংশ বাদ দেওয়া ঠিক নয়। পশু-বলিরও আবশ্যকতা আছে।" শরৎ মহারাজ যদিও পশু-বলির সমর্থন করিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি পশু-বলি পছন্দ করিতে-ছিলেন না তবে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এত কথা বলিতে-ছিলেন। যাহা হউক, দু'জনে এই সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বরাহনগরের বাজারে আসিলেন। তখন শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন এইজন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে পায়চারি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

কৌতুকরহস্য

শরৎ মহারাজ কখনও কখনও গিরিশ বাবুর কথিত গল্প

লইয়া নানা প্রকার কৌতুকরহস্য করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একজন লোক কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছিল। গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া সে ত এক মস্ত মাতব্বর লোক হইয়া বসিল। সকলে আসিয়া কলিকাতার বিষয় নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে এক ব্যক্তি কথা খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কলিকাতার রাণী রাসমণিকে দেখিয়াছে কিনা। মাতব্বর ব্যক্তি ত কিছুতেই হটিবার নয়। অমনি বলিল 'হ দেখছি।' জিজ্ঞাসু বলিল, 'কেমন দেখতে?' মাতব্বর লোক অমনি সুরু করিল, 'একটা পিড়া পাতছে আর একটা পিড়া ঠ্যাস মারছে। এক দিকে চিনির ধামা রাখছে আর এক দিকে তেলের কেড়ে রাখছে। চিনি থাবা থাবা খাচ্ছে, আর তেল পলা পলা খাচ্ছে, আর এই মোচে তাও লাগাচ্ছে।' এই বলিয়া শরৎ মহারাজ চক্ষু ও মুখভঙ্গী করিয়া নিজের ঠোঁটে হাত দিয়া গোঁপে চাড়া মারিতে লাগিলেন। মুখের, চোখের, হাতের এমন ভঙ্গিমা করিতে লাগিলেন যে, সকলে হাসিয়া অস্থির হইল। গ্রামবাসীর এমন কোন জ্ঞান নাই যে, রাণী রাসমণি পুরুষ বা স্ত্রীলোক, এবং তার খাইবার উচ্চ আদর্শ হইতেছে খানিকটা তেল আর খানিকটা চিনি, ইহা শুনিয়া প্রতিবাদ করে।

শরৎ মহারাজ আর একটি গল্প বলিতেন। গ্রীষ্মকালে এক মুটে মাথায় মোট লইয়া রাস্তায় যাইতেছে। রাস্তা তাতিয়া উঠিয়া তাহার পা জ্বলিয়া যাইতেছে, তাই সে আক্ষেপ করিয়া

বলিতেছে, "আল্লা যদি দিন দেন ত রাস্তায় গদি বিছাইয়া মোট বইমু।" এই কথাটি লইয়া কিছুদিন সকলেই হাসি কৌতুক করিয়া ছিলেন। সকলেই বলিতেন, "এইবার গদি বিছিয়ে মোট বইবো।"

ঔর্ব্ব্যচ্যবন

একদিন সকাল বেলা বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া আছেন। শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজের সহিত পুরাণের কথা পাড়িলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হৈ-হৈ ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে মারিতে লাগিলেন, তাহাতেও তাঁহাদের মনস্তুষ্টি না হওয়ায় ব্রাহ্মণপত্নী, যাঁহারা গর্ভবতী ছিলেন তাঁহাদের পেট চিরিয়া শিশু সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি হৈ-হৈরা নিতান্ত অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এক ব্রাহ্মণপত্নী গর্ভবতী ছিলেন, তিনি গর্ভস্থ সন্তানটিকে উরুর মধ্যে করিয়া সাধারণ ভাবে বসিয়া রহিলেন; হৈ-হৈরা এইজন্য তাঁহাকে বধ করিল না। অবশেষে যখন পরশুরাম হৈ-হৈদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মণপত্নী ভ্রূণটিকে বাহির করিয়া আনিলেন এবং যথাবিধি সন্তান প্রসব করিলেন। এই সন্তানই চ্যবন। গর্ভ অবস্থায় উরুতে ছিলেন এইজন্য তাঁহার নাম হইল ঔর্ব্ব্যচ্যবন। শরৎ মহারাজের গোত্রের প্রবর হইতেছে ঔর্ব্ব্যচ্যবন, এইজন্য বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজকে ঠাট্টা করিয়া ঔর্ব্ব্যচ্যবন

বলিয়া ডাকিতেন। এই ঔর্ব্ব্যচ্যবনের গল্পটি শুনিয়া তখন আমার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। শরৎ মহারাজ অতি কাতর ও ব্যথিতভাবে এই গল্পটি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

'হৈ হৈ' রা ভারতবর্ষীয় ছিলেন না। তাঁহারা চীন দেশীয়। চীন হইতে আসিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়া আফগানিস্থান এমন কি পাঞ্জাবের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হন। পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এই 'হৈ হৈ' ক্ষত্রিয়দিগের সহিত হইয়াছিল এবং তিনি ভারতবর্ষের লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। চীনদেশে মুসলমানগণ অদ্যাপি 'হৈ হৈ' বলিয়া অভিহিত হয়।

সারদা মহারাজের বাটীতে খাইতে যাওয়া

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠমাসের রাত্রে আলমবাজারের মঠ হইতে সকলে সারদা মহারাজের বাটীতে খাইতে গিয়াছিলেন। সারদা মহারাজের মাতা কি একটা ব্রত করিয়াছিলেন তাহা উদ্‌যাপন হওয়ায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়াছিলেন। সকলে শ্যামবাজারের চৌমাথায় সারকুলার রোডের বামদিকের একটা গলিতে সারদা মহারাজের বাটীতে গিয়াছিলাম। আহারের পূর্ব্বে শরৎ মহারাজ 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি' এই গানটি গাহিয়াছিলেন। অবশেষে আহারাদি করিয়া যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন।

Doctrine of Predestinarianism

বলরাম বাবুর বাটীর বড় ঘরটিতে বসিয়া শরৎ মহারাজ খৃষ্টান বই ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পড়িতেন। একদিন আমার সহিত এক তর্ক উঠিল। কথাটা হচ্ছে, Doctrine of Predestinarianism, অর্থাৎ মানুষ জগতে কি করিবে না করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই ভগবান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, মানুষ জগতে সেইটারই বিকাশ করিয়া থাকে। শরৎ মহারাজ তখন অতি মাত্রায় ভক্তির লোক ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, মানুষের কিছুই করিবার নাই, পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি পুরুষকারের মত লইলাম এবং বলিতে লাগিলাম যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় এবং উদ্যমে সমস্ত কাজ করিতে পারে। ভগবান আগে হইতেই তাহার বিষয় সমস্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই বা বিশ্বাসযোগ্যও কথা নহে। এটা শুধু ভক্তদের ভণ্ডামিমাত্র। ভক্তগুলো মুমূর্ষু নির্জীব ব্যক্তি, তাই এই রকম মত করিয়াছে। নিজের চেষ্টায় মানুষ সব করিতে পারে। ধ'রে নাও যদি ভগবান আগে থেকেই সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মানুষ নিজের শক্তিবলে তাহাও উল্টাইয়া দিতে পারে, কারণ তাহাদের ভিতর অসীম শক্তি রহিয়াছে। দ্বিতীয় কথা, পাপ পুণ্য ব'লে কোন জিনিষ থাকে না। ভাল মন্দ কিছুই থাকে না, কাহাকেও কিছু বলবার থাকে না। কারণ সব আগে

থেকে ঠিক হ'য়ে আছে, মানুষ সেই অনুযায়ী কাজ ক'রে যাচ্ছে; দায়ী ভগবান। কোন দোষের জন্য মানুষটাকে চাবুক্ না দিয়ে ভগবানটাকে চাবকাও, কারণ সেই সব ঠিক ক'রেছে। এটা হ'চ্ছে অতি হীনলোকদের কথা, কারণ ইহা মানুষকে জড় করে দেয় আর যে গুলো কুপ্রবৃত্তির লোক তাহারা বেশ ভগবানের দোহাই দেয়। এ অতি ভুল কথা। খৃষ্টান ভক্তগুলো মধ্যযুগে (Middle age) এই কথাগুলো বার ক'রেছিল। শরৎ মহারাজ তখন ভক্তির লোক ছিলেন, কাজেকাজেই ভক্তির মত থেকেই কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই জনে তর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে বৈকালবেলা গিরিশ বাবুর বাটীতে চা খাইতে যাইলাম এবং গিরিশ বাবুর কাছে এই কথা উঠিল। গিরিশ বাবু ভক্তলোক, শরৎ মহারাজের দিকেই কথা কহিতে লাগিলেন। আমি যদিও গিরিশ বাবুর মুখের উপর কোন কথা কহিতে পারিতাম না কিন্তু মনে মনে এ কথা একেবারেই মানিতাম না, আর বলিতাম, "তোমার ও সব পচা ভক্তির ভাব আমি জানি না। আমি নাস্তিক হবো সেও ভালো, তবু তোমার ও পান্তাভেতে ভক্তগিরী পছন্দ করি না।"

Doctrine of Election

আর একদিন কথা উঠিল, Doctrine of Election, অর্থাৎ ভগবান ইচ্ছা করিলে যাকে তাকে মুক্তি দিতে পারেন,

নিজের চেষ্টায় মুক্তিলাভ হইতে পারে না। যদিও জীবনে একজন দুরাচারী ও একজন ন্যায়পরায়ণ থাকে কিন্তু ভগবান ইচ্ছা করিলে দুর্বৃত্তকে সঙ্গে লইতে পারেন এবং ন্যায়পরায়ণকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "দুর্বৃত্ত ও ন্যায়পরায়ণ আমাদের মনুষ্য চক্ষুতে দেখি, কিন্তু তার ভিতরে কি আছে না আছে আমরা মনুষ্য চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাই না, এইজন্য ভগবান ইচ্ছা করিলে দুর্বৃত্তকে স্বর্গে লইতে পারেন এবং সদাচারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। অপর এক কথা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। মানুষের চেষ্টায় যেটুকু পুণ্য লাভ হয় তাহা ফলদায়ক বা কার্য্যকরী নহে। ভগবানের ইচ্ছাই বলবৎ। তিনিই ইচ্ছা করিলে মুক্তি দিতে পারেন তাহা ছাড়া মনুষ্য-চেষ্টায় হইতে পারেনা।" আমি তো Doctrine of Election-এর মহা বিরোধী ছিলাম এবং কয়েকদিন অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল; অবশ্য আমি পুরুষকারের পক্ষপাতী ছিলাম এবং এইরূপ ভক্তগিরী একেবারেই পছন্দ করিতাম না। যাহোক তবে, আমাদের যখন মীমাংসা হইত না, গিরিশবাবুর কাছে যাইতাম। তিনিও ভক্ত, কাজেই ভক্তের পক্ষ সমর্থন করিতেন। আমি যদিও চুপ করিয়া থাকিতাম কিন্তু এ সব এত মানিতাম না। আর শরৎ মহারাজ বলিতেন, "ওহে, তোমার এত কঠোর ফিলসফির ভাবটা ভাল নয়, ভক্তির ভাবটাও ভাল। ভগবানের কি মর্জ্জি, তিনি কি কর্ব্বেন, আমরা তার কি হিসাব জানি? তাঁর ইচ্ছায় সব হইতে

পারে। এইজন্য বলছি Doctrine of Electionটাও ভাল।”

Doctrine of Grace (কৃপাবাদ)

একদিন কথা উঠিল Doctrine of Grace (কৃপাবাদ), অর্থাৎ কৃপার কথা। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, কৃপা না হইলে কোন কাজ হইতে পারে না। মানুষের নিজের চেষ্টা মিথ্যা, ইহা শুধু অহঙ্কারপ্রসূত। মানুষ নিজেকে বড় মনে করে, ভাবে যে, আমিই কাজটা করিতেছি; কিন্তু কৃপা না হইলে কোন কাজই হইতে পারে না। কৃপাই একমাত্র পথ। আমি বলিতে লাগিলাম, “মানুষের নিজের শক্তি, চেষ্টা, উদ্যম হ'চ্ছে প্রথম জিনিষ; ইহাদের সঙ্গে কৃপা সংযুক্ত হয় ভাল, না হইলেও শক্তিমান পুরুষদের উদ্যমেও অনেক কাজ হয়।” এইরূপে ছ'জনে ছ'মতে অনেক তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল এবং দুই তিন দিন নানা বাদানুবাদের পর আমরা গিরিশ বাবুর কাছে সাব্যস্ত মানিতে যাইলাম। তিনি ভক্তির লোক, তিনি বলিলেন, “কৃপা ব্যতীত গাছের একটি পাতা পড়ে না এবং মানুষ এক পাও চলিতে পারে না। সবই কৃপার অধীন। মনুষ্যচেষ্টার কোন অর্থই নাই।” যা' হোক, সে কথা যদিও বন্ধ হইল কিন্তু উভয়ের মত পরিবর্ত্তন হইল না। যে যার নিজের ধারণা রাখিল এবং কয়েকদিনের পর তর্ক করা বন্ধ রাখিয়া দেওয়া হইল, কারণ দুজনেরই বিভিন্ন মত।' কিন্তু

এই সব বিষয়ে তর্ক কিছুদিন ধরিয়া হইয়াছিল এবং নানা প্রকার তর্কযুক্তিও দর্শান হইয়াছিল।

Salvation through Faith *

শরৎ মহারাজ এই সময় সেণ্ট পলের বিষয় খুব পড়িতেন এবং সেণ্ট পলের ভাবসমূহে তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি কয়েকদিন আমার সহিত ভক্তির বিষয় খৃষ্টানী ভাব লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন। একদিন Salvation through Faith-এর কথা উঠিল, অর্থাৎ বিশ্বাসেই মুক্তি হয়। অর্থাৎ প্রথমে একজনের উপর বিশ্বাস কর, সেই বিশ্বাসই মুক্তি আনিয়া দিবে। অবশ্য, এই বিশ্বাস এবং স্বামিজীর Doctrine of Personal Attachment, অর্থাৎ একজনের অপরকে শ্রদ্ধা করা, এক নহে। প্রথমটি হইতেছে কেবলমাত্র একটা মত বা এক ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে মুক্তির পথ খুলিয়া যাইবে। সেই পুরাতন এক-ঘেয়ে ভক্তদের তর্ক, তা সে বাংলা দেশের বৈষ্ণবদের মুখ হইতেই বাহির হউক বা মধ্যযুগের (middle age) খৃষ্টানদিগের মুখ হইতেই বাহির হউক। আমি অবশ্য এমতে বিশেষ আপত্তি ক'রতাম এবং দুজনে অনেক তর্কবিতর্ক হ'ত। St. Paul-এর এই সকল মত শরৎ মহারাজের মধ্যে

* নরেন্দ্রনাথের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছিল।

প্রবল হওয়ায়, তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া 'Paul সাহেব' বলা হইত। তখন কলিকাতায় Paul নামে একজন Advocate General ছিল। ঠাট্টাটা সেই সূত্রেই করা হইত। যাহা হউক এক্ষণে পুরাতন তর্কবিতর্ক উত্থাপন করিবার আর বিশেষ আবশ্যক নাই।

Vicarious Atonement

একদিন কথা উঠিল যে, যীশু মানুষের কল্যাণার্থে নিজে অতি কষ্টদায়ক মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই পরহিতে মৃত্যুই মনুষ্যকুলের মঙ্গলের কারণ। এই কথাতে আমি বলিলাম যে, যীশুর রীতিমত বিচার হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিজের তরফে কোন উকীল দিয়া সমর্থন করেন নাই। সেটা কার দোষ? অপর দিকে যেমন উকীল খাড়া হয়েছিল, তাঁর দিকে উকীল দেওয়া উচিত ছিল। সে কথা যা হ'ক, একজন মরিলে অপরের মঙ্গল হইবে কেন? এটা হ'চ্ছে মেয়েলী কান্নার দল পাকান, যে, যীশু মানুষের জন্য মরিয়াছে অতএব হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা যীশুকে মানিয়া লও। যীশুর কি ভাব ছিল তাই লইয়া বিচার হ'ক না কেন? যদি তাঁর ভাবের ভিতর কোন উচ্চ আদর্শ থাকে, জগৎ নেবে, না থাকে নেবে না। কিন্তু সে ক্রুশে মরেছিল কি বিছানায় মরেছিল এটা কোন বিশেষ তর্ক যুক্তির বিষয় নয়। আর ক্রুশে মরেছে বলেই যে, তাকে খৃষ্টানেরা এক

বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লে ঘোষণা ক'রবে, এটাও কিছু যুক্তির বিষয় নয়। আমি প্রসঙ্গক্রমে শরৎ মহারাজের কথাগুলি সমর্থন না করিয়া, অর্থাৎ শরৎ মহারাজের বিপক্ষ হইয়া শশী মহারাজের সহিত যোগ দিয়া আলমবাজারের মঠে তর্ক করি। শশী মহারাজ রুদ্র মূর্ত্তির লোক, তিনি ত Vicarious atonement-এর কথা একেবারেই গ্রাহ্য করিলেন না এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, " আরে, যীশুর কপালে অপঘাত মৃত্যু লেখা ছিল, তা খণ্ডাবে কে ? তাই তার অপঘাত মৃত্যু হ'ল।" অর্থাৎ Vicarious atonement of Jesus এর বিষয়টি শশী মহারাজ একেবারেই বিশ্বাস করিলনে না বরং হাসিয়া উড়াইয়া দিনেল।

Immaculate conception +

এক একদিন তর্কস্থলে আমি শরৎ মহারাজকে চটাইবার জন্য বিপরীত মত ধারণ করিতাম। Sermon on the Mount, Immaculate conception of Mary * এই সব

---

* Doctriue of Original Sin (মানবজাতির আদিম পাপ), Doctrine of Vicarious Atonement of Jesus (মানবজাতির পাপভার বহন করিয়া যীশুর মৃত্যুবরণ), Doctrine of Immaculate Conception of Jesus (যীশুর মাতৃগর্ভে প্রবেশকালীন নিষ্কলঙ্কতা) মতবাদগুলি St. Paul কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এইগুলিকে Pauline Doctrine বলা হয়।

বিষয়ে Ernest Renan * এর মত তুলে, Renan যে ভাবে প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছে সেই সব কথা খুব জোর করিয়া বলিতাম। শরৎ মহারাজ ভক্তির লোক, বলিতেন, "না হে, না, ও সব ঠিক নয়, মহাপুরুষ অবতারদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন। Renan ও সব কি ব'লেছে, সেই গুলোকেই কি মানতে হবে?"

"The Word was with God"

একদিন কথা উঠিল, "In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God!" এই word মানে কি? আমি বলিলাম, "এই word কথাটা গ্রীক logos—অর্থ, conception of divinity and expression, অর্থাৎ ঈশ্বর-জ্ঞান এবং সেইটা ভাষায় ব্যক্ত করা। অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরেতেই ছিল এবং সেই ঈশ্বরজ্ঞান মূর্ত্তিমান হইয়া বিকাশ হইয়াছে, এটার এই অর্থ। এইখানে কয়েকটি মাত্র কথা সন্নিবেশিত হইল, কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া খৃষ্টান মত বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে অনেক খৃষ্টান গ্রন্থ খুব বিশেষ করিয়া পড়া গিয়াছিল।

---

* Ernest Renan প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থ: Vie de Jesus, Antichrist, St. Paul, The Apostles, The Gospels ইত্যাদি।

সম্পাদক

Transfiguration *

একদিন শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "St. Francis নামে এক সাধক ছিলেন। তিনি ধ্যান করিতে করিতে কখনও কখনও ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁর হাতে পেরেক ফুটো করা দাগ লক্ষিত হইত। তিনি যীশুর ভাবে এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার শরীরেতে যীশুর চিহ্ন সকল লক্ষিত হইত।" ইহা কি করিয়া সম্ভব তাহা লইয়াও অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।

Rosicrucianism

একদিন Rosicrucian-দিগের কথা উঠিল। ভারতবর্ষে যাহাদিগকে কামাচারী বলে বা ভৈরবীচক্র সম্প্রদায় বলে, মধ্য-যুগে Europe-এ Rosicrucian নামে এক সম্প্রদায় ছিল। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, ইহারা একটা ক্রুশ রাখে। এবং মাঝের ডাণ্ডার দুই দিকেই লাল গোলাপ রাখে; এই লাল গোলাপ হইতেছে যন্ত্রপুষ্প। তান্ত্রিক সাধকেরা যেমন লাল জবা বা করবী যন্ত্রপুষ্পরূপে গ্রহণ করে, ইহারাও লাল গোলাপকে যন্ত্রপুষ্প বলিয়া থাকে। মাঝের ডাণ্ডা গৌরীপট্টের ন্যায় এবং সিধা ডাণ্ডাটা স্থাণুর ন্যায় কার্য্য করে। শরৎ মহারাজ এক সময় বলিয়াছিলেন যে, ঐ ক্রুশটাই

---

* বর্ত্তমান লেখকের Mind নামক গ্রন্থখানির ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক।

গৌরীপট্ট ও স্থাণুর চিহ্ন। সেইদিন ঐ বিষয়ে অনেক কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। Madam Blavatskyর "Secret Doctrine, vol. 3" গ্রন্থতে একস্থানে উল্লেখ আছে যে, খৃষ্টানদিগের ক্রুশটা প্রথম ধর্ম্মচিহ্ন ছিল না, পরে এইটা ধর্ম্মচিহ্ন হইয়াছিল এবং ইহা প্রাচীনকালের স্থাণু ও গৌরীপট্টের চিহ্ন। পরে ইহা যীশুর মৃত্যুযূপকাষ্ঠরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আলমবাজার মঠের অবস্থা

বরাহনগর মঠে যেরূপ টানাটানি ও কষ্ট চলিতেছিল আলমবাজার মঠে প্রথম অবস্থাতে ঠিক তদ্রূপই চলিতে লাগিল, কিন্তু কয়েক মাস পরে অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হইল। বরাহনগরের মঠের প্রথম অবস্থাতে সকলেরই সন্দেহ হইল যে, গোটাকতক ছোঁড়া স্কুল ছেড়ে চাকরী ছেড়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে পড়ে থাকে, হুজুগ করে ; হয়ত দু'দিন পরে যে যার বাড়ী চ'লে যাবে আর গুলতুনির দল ভেঙ্গে যাবে। এইজন্য লোকে সন্দেহ অবজ্ঞা করিয়া যুবকমণ্ডলীকে দেখিতে আসিত। কিন্তু যখন কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল এবং সকলেই প্রাণ দিয়া ভগবানলাভের ইচ্ছায় স্থির রহিল, দুঃখ দারিদ্র সকলেই সহ্য করিল, ক্রমেই লোকের ভাব পরিবর্ত্তন হইল এবং একটু শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল। বরাহনগরের মঠে পুলিশ যেমন তীব্রদৃষ্টিতে দেখিত আলমবাজার মঠে প্রকাশ্যে সেইরূপ

রহিল না, তবে ভিতরে অন্য প্রকার। এই সময় হইতে দু'দশ জন ভদ্র লোকও আলমবাজারের মঠের খবরাখবর লইতেন এবং মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন। যা'হোক, প্রথমমুখের কষ্টটা একটু কমিল; এবং আগন্তুক ব্যক্তিরা ঠাকুরের জন্য মিষ্ট সামগ্রী আনিতেন। ক্রমেই বেশ একটি জমাট দল হইল এবং উৎসব উপলক্ষে আলমবাজার মঠে মাঝে মাঝে অপর্য্যাপ্ত জিনিষপত্র আসিত। শশী মহারাজ কর্ত্তা, তাঁর উদারতা ছিল, পরিতোষ করিয়া লোকদের খাওয়াইতেন এবং অবশিষ্ট যাহা থাকিত, যে সকল ভক্ত ইচ্ছা করিত তাহাদের সঙ্গে আপন আপন বাটী পাঠাইয়া দিতেন। শশী মহারাজ পরদিবসের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতেন না। যা'হোক ক্রমে ক্রমে একটু ভদ্রয়ানা ভাব হইতে লাগিল এবং অবস্থাও একটু সচ্ছল হইল। মুষ্টিভিক্ষা করিবার আবশ্যক রহিল না এবং ভক্তমণ্ডলীর যে যাহা পারিতেন সকলেই কিছু কিছু পাঠাইয়া দিতেন। প্রথমে ববাহনগরের মঠে ঠাকুরের রাত্রের ভোগের জন্য কয়েকখানা রুটি ও একটু সুজির পায়েস হইত কিন্তু আলমবাজারের মঠে রাত্রের ভোগ কয়েকখানা লুচি ও সন্দেশ বরাদ্দ হইল। শশী মহারাজ রাত্রের প্রসাদী লুচি লইয়া প্রসাদভাবে সকলের পাতে একটু একটু দিতেন এবং বাকিটা প্রাতে সকলে যখন চা খাইতে বসিতেন সেই লুচি আর সন্দেশ সকলকে দিয়া দিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে আলমবাজারের মঠ বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষুধা

একদিন সন্ধ্যার সময় হৃদু মুখুয্যে আসিয়া আলমবাজার মঠে বলিয়াছিল যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালে একবার বিষম ক্ষুধার অবস্থা আসিল। এইমাত্র খাইয়া উঠিলেন, তাহার একটু পরেই ভুলিয়া যাইতেন। একদিন সন্ধ্যার পর খেয়েদেয়ে শুয়েছেন আর আমিও তাঁর কাছে শুইয়া আছি। একটু পরে মামা উঠে 'ক্ষিদে ক্ষিদে' করতে লাগলেন। তখন আর আমি কোথায় কি পাব, বললুম, চুপ ক'রে শুয়ে থাক, সকাল হ'লে যা'হোক হবে। কিন্তু মামা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। আমি অগত্যা উঠে রান্নাঘরের হাঁড়ি খুঁজিতে লাগিলাম এবং দেখিলাম যে, পান্তা ভাত আছে। আমি সেই পান্তা ভাত ও গুড় এনে দিলাম, মামা তাই খাইয়া সুস্থ হইয়া শয়ন করিলেন।

শরৎ মহারাজ এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্প বলিয়াছিলেন। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালে মহা ক্ষুধার ভাব হইল, কিছুতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। অবশেষে একটা ঘরে ধামা চাঙ্গারি ক'রে নানাপ্রকার খাবার দেওয়া হ'ল। তা সে চিড়া মুড়কি হ'তে ভাল ভাল যা কিছু হয়—মেঠাই প্রভৃতি সমস্ত কিছু, সব রকম ঘরের চারিদিকে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই ঘরে বসিয়া দু'হাতে যাহা ইচ্ছা আহার করিলেন এবং এইরূপ খানিকক্ষণ আহার করিবার পর অত্যধিক ক্ষুধার

ভাবটা চলিয়া যাইলে আবার তিনি সুস্থির হইয়া সাধারণভাবে আহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম বেদ

শরৎ মহারাজ একদিন বলরাম বাবুর বাটীতে বৈকালবেলা বলিতে লাগিলেন, "ওহে, শুনেছ ত হাঁদুর চিরকালই তো চার বেদ আছে, কিন্তু General Sir Cunningham লিখেছেন যে, তিনি হিন্দুদের পঞ্চম বেদ পেয়েছেন। এই তো এক হুলুস্থুল পড়ে গেল। তারপর কিছুদিন পরে লিখলেন যে, পঞ্চম বেদটা মিথ্যা, ওটা একটা জুচ্চুরি। হ'য়েছিল এই যে, বহুকাল আগে কতকগুলো Jesuit দক্ষিণ ভারতবর্ষে আসে, তারা ত পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক ক'রতে যায়, কিন্তু তর্কে হেরে যায়। তারপর ফন্দি ক'রে গোটাকতক দক্ষিণা পণ্ডিতকে কিছু টাকা খাওয়ালে আর মুখে যীশুর বাইবেলের গল্পটা ব'লে গেল, আর সেই পণ্ডিতদের দিয়ে গল্পটা বেদের পুরানো সংস্কৃততে লিখিয়ে নিলে। একদিন এক রাজার বাটীতে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা ডাকল আর Jesuitরা তোড়জোড় নিয়ে তর্ক ক'রল। খানিকটা তর্ক ক'রে পুঁটলি থেকে পুরানো পুঁথি বার ক'রে বসল। সত্যসত্যই পুরানো কাগজ, পুঁথির ভাবে লেখা। এই Jesuitরা মহা আহ্লাদ ক'রে সেই পুরানো পুঁথি থেকে প'ড়ে শুনাতে লাগলো। বৈদিক ছন্দ এবং বৈদিক শব্দ। তাহাতে ঈশা অবতারের কথা, আর বাইবেলে যেমন আছে ঠিক সেই

রকম গল্প। এই ত পণ্ডিতরা অবাক হ'য়ে গেল আর Jesuitরা বগল বাজাতে লাগলো আর বলতে লাগলো যে, এ দেশের পণ্ডিতরা পঞ্চম বেদ ভুলে গেছে, 'চার বেদ চার বেদ' ক'রে চেঁচায়। তারপর Cunningham সমস্ত ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখে সাব্যস্ত করলেন যে, এসব মিথ্যা, Jesuitদের রটান।" শরৎ মহারাজ সেইদিন উত্তেজিত হ'য়ে এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ

এই সময়ে শরৎ মহারাজ অল্পদিনের জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এখান ওখান থেকে জোগাড় ক'রে যাহা পাইয়াছিলেন সে ক'খানা বেশ নিবিষ্ট মনে পাঠ করিয়াছিলেন। তবে কি কি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক মনে নাই। বরাহনগরের মঠে 'ললিতবিস্তার', 'প্রজ্ঞা-পারমিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ হইয়াছিল এবং শরৎ মহারাজ বেশ নিবিষ্ট মনে সে সব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ হইয়াছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধের এক শিষ্য বা তৎসংক্রান্ত এক ব্যক্তির নাম 'সারি পুত্র' বা 'মুদ্‌গলায়নে'র নাম আছে। শরৎ মহারাজ আদর ক'রে সারদা মহারাজকে (ত্রিগুণাতীত) সারি পুত্তুর ব'লে ডাকতেন এবং তা দেখাদেখি, দু'একজন লোক সারদা মহারাজকে "সারি পুত্তুর" "সারি পুত্তুর" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাতে যাওয়া

সুরেশবাবু মঠ স্থাপন করিবার জন্য ৫০০৲ শত টাকা বলরামবাবুর কাছে রাখিয়া যান। সেই টাকা বলরাম বাবুর কাছে কয়েক বৎসর ছিল। বরাহনগরের মঠের সময় যখন আমাদের বাটীতে মোকর্দ্দমা হয়, তখন নরেন্দ্রনাথ ও শরৎ মহারাজ বলরাম বাবুর নিকট হইতে সেই টাকা ধার করিয়াছিলেন। দেড় বৎসর পরে টাকা পাওয়া গেলে সেই টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হয়। টাকাটা কোম্পানীর কাগজে ছিল এইজন্য শরৎ মহারাজ ও আমি দুইজনে অতুল বাবুর নিকট হইতে চিঠি লইয়া প্রসাদ দাস বড়ালের অফিসে যাই এবং কাগজ ভাঙ্গাইয়া বলরাম বাবুর ঋণ শোধ করি। সুরেশ বাবুর সেই টাকা পুনরায় বলরাম বাবুর নিকট গচ্ছিত রহিল। এইরূপ শ্রুত আছি যে, পরে সেই টাকায় বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরের মার্ব্বেল পাথর কিনিয়া দেওয়া হয়। এই গল্পটির উদ্দেশ্য এই যে, শরৎ মহারাজ সাধু হইলেও নরেন্দ্রনাথের জন্য সব কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; তাহাতে তাঁহার মান অপমান জ্ঞান থাকিত না।

শিশ্ন-দেবা

একদিন বলরামবাবুর বাটীতে শরৎ মহারাজের সহিত কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন যে, স্থাণু আর গৌরী-পট্টের যে পূজাটা এখন চ'লেছে, ওটা বৈদিক আর্য্যদের ছিল

না, ওটা দক্ষিণের দ্রাবিড়দের প্রথা। বেদেতে দক্ষিণীদের 'শিশ্ন-দেবা' ব'লে গালাগালি দিচ্ছে (Phallic worshipper)। এটা আর্য্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে এটা উত্তর ভারতে চ'লে এসেছে এবং পরে নানারকম ব্যাখ্যা হ'য়েছে। কিন্তু এই শিশ্ন পূজা, এটা ভারতের বাহিরে অনেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে, এমন কি খৃষ্টানদের Crossটা আগে phallic চিহ্ন ছিল, পরে নাম বদলে যীশুর মৃত্যু-চিহ্ন দাঁড়িয়েছে। সেইদিন এই শিশ্ন পূজা উপলক্ষে অনেক কথা চলিতে লাগিল।

শরৎ মহারাজের এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিশ্ন পূজা বিদেশী পূজা, বৈদিক পূজা নহে।

অ্যাসিরিয়ানদের (Assyrian) ভিতর দু'টা ঠাকুর পাওয়া যাচ্ছে—"ইয়া" আর "অণু"। "ইয়া" মানে Earth আর "অণু" মানে Firmament. প্রথম অবস্থায় একটা পাথরেতে গোল আকার ক'রে কেটে কেটে দিতো, এইটা হ'তো আকাশ। কিন্তু পরে তারা দুইটা মূর্ত্তি তৈরী করলে, একটা স্ত্রী আর একটা পুরুষ। ওদের মত হ'চ্ছে এই 'Ea' আর 'Anu' বা পৃথিবী ও আকাশের সংমিশ্রণে সমস্ত সৃষ্টি হ'চ্ছে। এইজন্য বৎসরকে তারা ঋতুতে বিভাগ ক'রলে। মাঠেতে লাঙ্গল দিলে যে furrow বা গর্ত্ত হ'লো তাতে বীজ দিয়ে মাটি চাপা দিলে—এইটা তারা বলছে যে, সৃষ্টি-প্রকরণ। মাঠের পক্ষে যে রকম নিয়ম, জীবের পক্ষেও ঠিক সেই রকম নিয়ম।

অ্যাসিরিয়ানদের এক শাখা ফিনিশিয়ান (Phoenician)। তাহাদের এক শাখার ছিল Baal আর Astaroath। Baalটা পুরুষ আর Astaroath স্ত্রী। গ্রীকদিগের ভিতর এই Baal পরে Bacchus হ'য়ে প্রবেশ ক'রেছিল। কিন্তু গ্রীকদের প্রাচীন দেবতা Dionysus, সে অন্য প্রকার ছিল। Dionysus ঠাণ্ডা মূর্ত্তির ঠাকুর ছিল এবং সুরা ও ঔষধাদির দেবতা ছিল, অপকর্ম্মের দেবতা ছিল না। কিন্তু পরে Bacchus অপকর্ম্মের দেবতা হইল এবং কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, আলেকজাণ্ডারের মা অলিম্পিয়াস এপিরট (Olympias Epirot) পাহাড়ী রাজার মেয়ে ছিল। মহা দুর্দ্ধর্ষা মেয়ে। অলিম্পিয়াস, Bacchanalian Orgies বা চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমন কি মদ খেয়ে বিবস্ত্রা হ'য়ে হাতে সাপ জড়িয়ে নৃত্য করিত।

ইব্রাহিম যখন নিনিভ (Ninu—Fish. Nineva—town of fish—মৎস্যপুর, এই নগরে মৎস্যই প্রধান দেবতা ছিল) হইতে অপসারিত হইল তখন তাহার পৈত্রিক দেবতা 'Ea' এবং 'Anu' এদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'আদম' এবং 'ইভ' নামে অভিহিত হইল এবং উভয়েই উলঙ্গভাবে মাঠে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহুদীদের মতে এই আদম এবং ইভ হইতে মানবকুল হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে সিরিয়াতে Nosairian বা অর্দ্ধখৃষ্টান নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা "মালিক তায়ুক" বা

ময়ূররাজ পূজা করে। যেটাকে অপর ধর্ম্মে শয়তান বলে, তাহাদের ওটা বলিতে নাই; তাহারা ময়ূররাজ বলে। তাহাদের ভিতর আজও চক্র হইয়া থাকে এবং ঐরূপ বীভৎস ভাবে হইয়া থাকে।

বাংলা দেশে ভৈরবী পূজা এবং গুজরাটের 'চলি' (কাঁচুলি) পূজাটা ফিনিশিয়ানদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কারণ তৎকালে ফিনিশিয়ান বা 'পুনিক'রা সিন্ধু নগরে পাতাল (পোতালয়) নামে এক বন্দরে ব্যবসা করিতে আসিত এবং তাহাদের দেশীয় পূজাপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করিয়া যায় এবং বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) নগরে পুনিকরা ব্যবসা করিতে আসিত। মিশর দেশেও শিশ্ন পূজার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বিবাহ-প্রথা ছিল না

একদিন শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, অতি প্রাচীনকালে বিবাহ-প্রথা ছিল না। তখন ইচ্ছা হইলেই যে যার স্ত্রীকে লইয়া যাইতে পারিত এবং সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। তারপর এক ঋষি ও তাহার পুত্র বসিয়া আছে এমন সময় অপর এক ঋষি আসিয়া ঋষিপত্নীকে লইয়া গেল। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এ ব্যক্তি তাহার মাতাকে লইয়া যাইতেছে কেন? ঋষি বলিলেন যে, ইহাই হইতেছে প্রথা। একজন স্ত্রীলোককে অপর পুরুষ লইয়া

যাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না; ঋষিপুত্র এই শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল এবং অভিসম্পাত করিল যে, কেহই অপরের স্ত্রীকে লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তখন হইতে বিবাহ প্রথা হইল। এই প্রসঙ্গটি মহাভারতের আদি পর্ব্বে আছে। সমাজের অতি প্রাথমিক অবস্থায় এই পদ্ধতি ছিল এবং বিষয় সম্পত্তি সঙ্ঘের ছিল, ব্যক্তিগতের ছিল না, এই ভাবটি দেখান হইয়াছে। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "সভ্যতা কি সহজে হ'য়েছে? অতি সামান্য ভাব থেকে এত বাঁধাবাঁধি কড়াকড়ি নিয়ম হ'য়েছে। কোন জিনিষটা তুচ্ছ ব'লে অবজ্ঞার জিনিষ নয়, সব জিনিষ শিখে নিতে হয়।" সেদিন বলরাম বাবুর বাটীতে এ বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। বিবাহ অষ্ট প্রকার, ইহাতে Concubinage ও Temporal marrtageও নির্দ্দেশ ক'রে গেছে, তবে ওগুলো অতি ঘৃণিত কার্য্য ব'লেছে; কিন্তু সেটা বিবাহের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

Mary Antionette (মেরী অ্যান্টিয়নেট)

একদিন ফরাসী বিদ্রোহের কথা উঠিল। মেরী অ্যান্টিয়নেট ফ্রান্সের রাণী, অষ্ট্রিয়ার রাণী মেরিয়াথেরেসার কন্যা। তার মত সুশ্রী স্ত্রীলোক তখন ইউরোপে ছিল না। একে অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়াথেরেসার কন্যা, তায় ফ্রান্সের রাণী, ভোগবিলাসের চূড়ান্ত করিল। জগৎটা যেন তার ভোগের

জন্য হ'য়েছে। তার চুল ছিল কাল মিশমিশে, তেমনি হাঁটুতে লুটিয়ে পড়ত, তার চুলের পরিপাটীই বা কি ছিল, আর কি সুখ্যাতিই ছিল! এ রকম চুলের বাহার এবং বর্ণনা কোন স্ত্রীলোকেরই পাওয়া যায় না। বয়স জোয়ান, ৩১।৩২ বৎসরের ভিতর। কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের প্রথম মুখটায় যখন মেরী এণ্টোনিয়েটকে কয়েদখানায় রাখিল এবং তাহার মাথা কাটিবার জন্য বাহির করিয়া আনিল তখন তাহার মিশমিশে কাল চুল একেবারে ধপ্‌ধপে শাদা হইয়া গিয়াছে। মেরী এণ্টোনিয়েট একেবারে বুড়ী হইয়া গিয়াছে, তার মুখে সব কোঁচকান দাগ প'ড়েছে। তারপর তার মাথা কাটা হ'লো। বিভীষিকা বা ভীষণ চিন্তা হ'লে শরীরের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা তার একটা বিশেষ উদাহরণ। যে আগের দিন অতি সুশ্রী যুবতী রাণী ছিল, সে পরের দিন পাকা চুল মাথায় একেবারে বুড়ী হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মনের চিন্তাশক্তির কি ভীষণ তেজ!

পণ্ডিত ব্যক্তির কার্য্যকরী বুদ্ধি হয় না

শরৎ মহারাজ এক হাসির গল্প বলিতে লাগিলেন। এক বড় ন্যায়ের পণ্ডিত তার ছাত্রদিগকে ন্যায় পড়াইত। খুব বড় মাথা আর টিকি নাড়িতেছে। ভট্‌চাযিয্‌ গিন্নি উনুনে ডালের হাঁড়ি চড়িয়েছে। ঘরে জল নাই, ঘড়া কাঁকে করে পুকুরে জল আনতে গেল। যাবার সময় স্বামীকে বলে গেল, "ডালটা

উনুনে চড়িয়েছি, একটু নজর রেখ, যেন উথলে না পড়ে।” ভট্চায্যের কথাটা কানে আছে। ডালটা উথলে উনুনে পড়লো, খানিক পরে পোড়া গন্ধ বেরুল। ডালটা উথলে উনুনে পড়ছে আর ভট্টাচার্য্যি তার পৈতা আঙ্গুলে জড়িয়ে ইষ্টমন্ত্র ও গায়ত্রী জপ করছে। ডালটা বেয়াদব. তার কথা না শুনে উথলে পড়তে লাগলো। সে আরো জোরে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল, এমন সময় তার স্ত্রী এসে ডালে এক পলক তেল দিতে ডালটা গ্যাঁজলা কেটে তলায় চলে গেল। গিন্নী বললে, “তোমার এ আক্কেল নেই।” ভট্টাচার্য্যি ত দেখে অবাক। সে তার স্ত্রীর এক স্তব করিতে আরম্ভ করিল যে, তুমি আদ্যাশক্তি ইত্যাদি। স্ত্রীর ত তখন ডাল উথলে পড়ে ; সে বল্‌ল, “আহাম্মক ! কেবল পুঁথি পড়াতে জান, গৃহস্থালী কাজ কিছুই জান না।” ভট্টাচার্য্যি বল্‌লে, “তা বটে, তবে এটা ত ন্যায়ের বইতে লেখা নেই।” শরৎ মহারাজ বলিলেন যে, পুঁথিপড়া লোকের কোন কার্য্যকরী বুদ্ধি হয় না। এই গল্পটি লইয়া শরৎ মহারাজ হাসি তামাসা করিতেন।

নাগ মহাশয়ের দেশে যাওয়া

শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজ উভয়েই এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। এক সময়ে শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে নাগ মহাশয়ের বাটীতে যান এবং তাঁহার বাটীতে আহার করিতে মনস্থ করেন। নাগ

মহাশয় ত হাঁড়ীর ভাত কিছুতেই দিবেন না এবং বলিতে লাগিলেন,—"আপনাদের হাঁড়ির ভাত কি ক'রে দেব, আপনারা রেঁধে খান।" কিন্তু উভয়েই বলিতে লাগিলেন,—"আপনি উচ্চ অবস্থার লোক, আপনার ভাত খেতে কি দোষ?" কিন্তু নাগ মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আপনারা যে ব্রাহ্মণ, আপনাদের গলায় পৈতা দেখেছি আমার বেশ মনে আছে।" তারপর নাগ মহাশয়ের পিতার কথা উঠিল। নাগ মহাশয়ের পিতা খুব জপ করিয়া থাকেন কিন্তু কিছু হ'চ্ছে না, তার কারণ তাঁর প্রতি অর্থাৎ নাগ মহাশয়ের প্রতি বড় স্নেহ আছে। নাগ মহাশয় বলিলেন, "ওটা কি জানেন, নোঙ্গর বেঁধে দাঁড় টানা।" হরি ও শরৎ মহারাজ বলিলেন, "আপনার মত ছেলেকে স্নেহ করবেন না?" নাগ মহাশয় বলিলেন, "তা কি হয়, এ যে সন্তান ব'লে স্নেহ করা, সেই জন্যই জপ ধ্যানের বিশেষ ফল হ'চ্ছে না।"

মতি মুখুয্যে

ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় কাশীপুর গভর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। বেশ প্রবীণ ধর্ম্মপরায়ণ লোক এবং তিনি একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। প্রথমে চিকিৎসা উপলক্ষে আলমবাজার মঠে যান এবং শরৎ মহারাজের সহিত কথা-বার্ত্তা হয়। তারপর মতি ডাক্তার শরৎ মহারাজের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আলমবাজার অঞ্চলে যাইলেই

অনেকক্ষণ ধরিয়া শরৎ মহারাজের সহিত নানা বিষয় আলোচনা হইত। অনেক শাস্ত্র এবং ভক্তির কথা হইত। তিনি ব্রাহ্ম ভাবের লোক ছিলেন, বিগ্রহ পূজা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু মঠেতে মানস পূজা বা গুরুপূজা হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, ঠাকুরের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া একটা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। তাঁর কথাবার্ত্তা বড় কৌতুকের ছিল। একদিন লাটু মহারাজ একটা কৌপীন পরিয়া বসিয়া আছে, বহির্ব্বাস নাই এবং মাথায় একটা কাপড়ের ফালি জড়াইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। মতি ডাক্তার আসিয়া লাটু মহারাজকে ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "এটিকে কোথায় পেলেন? এর জন্যই ত Scientistরা এত খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হোক, একে পেয়েছেন দেখে বড় খুশি হ'লাম। এটি দেখছি যে, Darwin-এর missing link, খবরের কাগজে একটু সংবাদ দিলে অনেক Scientist (বৈজ্ঞানিক) একে দেখতে আসবে।" এই তো আমরা সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। শরৎ মহারাজের সহিত হৃদ্যতা হওয়ায় মতি মুখুয্যে যেন আলমবাজারের ডাক্তার হইয়া রহিলেন এবং খবরাখবর লইতেন এবং নিতান্ত আপনার লোক হইয়া পড়িলেন।

বেলুড়ে মাতাঠাকুরাণীর অবস্থান

বেলুড়ে বর্ত্তমান মঠের পার্শ্বে নীলাম্বর মুখুয্যের বাগানে

তখন সামান্য একটুখানি একতলা বাড়ী ছিল, কয়েকটি মাত্র ঘর। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এক সময় কয়েক দিন সেই বাগানে বাস করিয়াছিলেন। যোগেন মহারাজ তত্ত্বাবধান করিতেন এবং শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে সেখানে যাইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে চলিয়া আসিতেন। তখন সামান্য একটা বাগান এবং সামনে কতকগুলি বাহাদুরী কাঠ বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিত। আমি ও শরৎ মহারাজ গঙ্গার ধারে সেই কাঠের উপর বসিয়া নানা কথা কহিতাম। কেশব বাবুর 'জীবনবেদ', চিরঞ্জীব শর্ম্মার (ত্রৈলোক্য সান্যালের) 'নিমাই চরিত' বা 'চৈতন্য জীবনী' নামক গ্রন্থ, এইরূপ অনেক বিষয়ের আলোচনা হইত। অর্থাৎ দু'জনে গঙ্গার ধারে ব'সে বিকাল বেলাটা মন খুলে অনেক কথা হ'ত এবং অনেক বই থেকে কথা তুলে আলোচনা হ'ত, সে বড় আনন্দের স্মৃতি! ঘাসের উঠানেতে একটা ঘাসকাটা রুল-কল ছিল। যোগেন মহারাজ মাঠের দিকের রকটিতে বসিয়া থাকিতেন। আমি মাঝে মাঝে সেই ঘাসকাটা কলটা দিয়া ঘাস কাটিয়া বেড়াইতাম। যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও আমি তিনজনে হাসতে হাসতে খেলা করতে করতে অনেক কথা কহিতাম। যোগেন মহারাজ একটু টিপ্পনী কাটিয়া রাগাইয়া দিতেন, তারপর কথাটা বেশ জমিয়া যাইত। সে সময়কার একটা অতি মধুর স্মৃতি আছে।

সেকশপিয়ার ও গিরিশ ঘোষ

একদিন নাট্যকারদের কথা হইতে লাগিল। শরৎ মহারাজ হ্যামলেট হইতে কথা তুলিলেন, "Angels and ministers of grace defend us", ইত্যাদি। তারপর ম্যাকবেথ থেকে Dagger scene-এর কথা উঠিল, "Is this a dagger which I see before me"! তারপর Lady Macbeth-এর কথা উঠিল, "To beguile the time, look like the time" ইত্যাদি। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সেকশ-পিয়র নাটকে সমাজের কেবল ভীষণ ভাবটা চিত্রিত করিতেছে। মারপিট, কাটাকাটি, খুনখারাপি এই নিয়েই ত সেকশপিয়র নাটকের চিত্র। ওদের দেশটা যেমন রক্তপিপাসুর দেশ সেই রকম সব সময়ে কাটাকাটি মারামারি ক'চ্ছে। ওদের নাটকের খানিকটা পড়লে বুকটা ধড়ফড় করে, যেন কোন্ দিক থেকে কে এসে ছোরা মারবে। এই জন্যই আমার সেকশপিয়র ভাল লাগে না। জাতটার ভিতরকার ক্রিয়া যেন সব এঁকে এঁকে দেখিয়েছে। 'ওথেলো' পড়ে দেখুন, 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' পড়ে দেখুন, সেই এক কথা। রোমিয়ো জুলিয়েট-এতেও সেই খুন খারাপি। 'হ্যামলেট'এ দেখুন, পাগল হ'য়ে গেল। মারামারি আর কাটাকাটি; যেন একটা খুনে ডাকাতের দল। এতেই ত আমার সেকশপিয়রের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কমে যায়। আমরা হিন্দু, আমাদের ভাব স্বতন্ত্র।

সমাজের ভীষণ ভাব দেখতে বা দেখাতে পছন্দ করি না। ওটা অপ্রকাশ্য জিনিষ, অপ্রকাশ্যভাবে চিরকাল থাকে। কোন্ দেশেই বা সমাজের ভিতর খারাপ জিনিষ না আছে? সেটা নিয়ে হৈ চৈ ক'রে আর লাভ কি? সমাজের উৎকৃষ্ট ভাব নিলে উন্নতি ক'রতে পারবে। কিন্তু ভীষণ ভাব দেখালে সমাজের লোকের ভিতর ভীষণ প্রবৃত্তি জাগবে এবং তাহাতে বড় অনিষ্ট হইবে। সেই জন্য আমাদের সংস্কৃত নাটকে এইরূপ দুর্বৃত্ত ভালবাসা দেখায় নাই। উচ্চ ভালবাসা, শান্ত ভালবাসা প্রভৃতি দেখাইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "সমাজে যেটি আছে ঠিক সেইটাই দেখান উচিত; It is an art to describe nature but the art itself is nature। এই রকম মনের Psychological development আর কোথায় দেখান হয়েছে? কোন কোন অবস্থায় মনের গভীর স্তরে কিরূপ চিন্তা ওঠে সেকশপিয়র সেইটাই দেখিয়েছেন।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "আ-হা-হা, মরি! মরি! যত খুনে মিনসে আর শয়তানী মাগী, নানা রকম দুষ্টামি ক'চ্ছে আর সেইটা তোমার কাছে Psychological development! যে পড়ে তার মনটা উপর দিকে উঠিয়ে দেওয়া দূরে থাক, নীচের দিকে নামিয়ে দেয়। দয়াদাক্ষিণ্য সদ্গুণ কিছুই নাই। তুমি বাপু পণ্ডিত লোক, তোমার সেকশপিয়র ভাল লাগে। আমি মূর্খ লোক, আমার ভাল লাগে না, তবে কলেজে পড়তে

হয়েছিল, পড়েছিলাম; ওর চেয়ে আমার গিরিশ ঘোষের লেখা ভাল লাগে। ওতে এমন খুনের কথা নেই, বরং ঢের ভাল ভাব আছে। এই জন্য সেকশপিয়রের বইয়ের চেয়ে আমি গিরিশ ঘোষের বই ভালবাসি। আর দেখ, সেকশ-পিয়রের ছবি সব একই। আর গিরিশ ঘোষের ভিতর দেখ, কত রকম লোকের কত রকম ছবি। Monotonyর বা এক-ঘেয়েমির লেশ মাত্র নাই। একটা সিদ্ধ মহাপুরুষ থেকে— বুদ্ধ বল, চৈতন্য বল, পূর্ণচন্দ্র বল এই সব থেকে বিল্বমঙ্গলের সাধক পর্য্যন্ত সকলের চিত্র আছে। দেখ, চোরটা পর্য্যন্ত বলছে, 'যদি দাগাবাজি ছাড়ি, কেষ্ট পেলেও পেতে পারি'। এক এক জায়গায় দেখ, অতি উচ্চ আদর্শের কথা রয়েছে, এক বিষয়ের আদর্শ নয়, বহু বিষয়ের আদর্শ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, একঘেয়েমি ভাল নয়। গিরিশ ঘোষের বইতে একঘেয়েমি নেই। আর গিরিশ বাবুর সব বইতেই দেখ, মনটা উঁচু দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই ত' হ'লো নাটকের উদ্দেশ্য।"

নরেন্দ্রনাথের 'মিল্টন' পড়া

আর একদিন কথা হইল যে, নরেন যখন মিল্টন (Milton) পড়ে, বেশ গম্ভীর স্বর হয়, ওরকম প্রায় দেখতে পাওয়া না। নরেন যখন Paradise Lost-এর Satan-এর Speech পড়ে, তখন একটা rolling sound শুনতে পাওয়া যায়।

এমন কি, যখন মাইকেল পড়ে তখনও সেই rolling sound শুনতে পাওয়া যায়। এইটাই হইতেছে নরেনের মাইকেল বা মিল্টন পড়ার বিশেষত্ব। এরকম স্বরভঙ্গিমা দিয়ে অপর কেউ পড়তে পারে না। আর দেখ, নাটকই হউক আর কাব্যই হউক, এ রকম স্বর-ভঙ্গিমাতে (Intonation) একটা বিশেষ মানে হয়। কথা দেখে দেখে পড়লে একটা মানে হয়, আর নটের interpretation (প্রকাশভঙ্গি) একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। গিরিশ ঘোষ বলেন যে, Actor's interpretation ও intonation হ'চ্ছে Dramaর প্রাণ। অর্থাৎ নটের প্রকাশভঙ্গি ও স্বরভঙ্গিমা হ'চ্ছে নাটকের প্রাণ। এগুলো প্রয়োগ করলে একটা নূতন মানে হ'য়ে যায়। স্বরভঙ্গিমার উপর Gesture আর Posture (অধিষ্ঠান ও অঙ্গভঙ্গি) কি রকম হবে, সেটাও দেখাতে হয়, অর্থাৎ কি রকম ক'রে দাঁড়িয়ে কি রকম ভাবভঙ্গিতে কথা উচ্চারণ করবে, সেটা না বলতে পারলে নাটক হলো না। অনেক সময় খারাপ নাটকটাও Actor's interpretation, নটের প্রকাশ ভঙ্গির উপর খুব successful (সুন্দর) হয়ে যায়। আমি বলিলাম, "স্বামীজী যে, মিল্টন—Slow, mournful, rolling, sonorous voiceএ * পড়তেন, ওটা তিনি হেদোর, অর্থাৎ স্কটিশচার্চ কলেজের প্রফেসার উইলসনের (Wilson) কাছ থেকে শিখে-

* ধীর, করুণ, গমগমে ও গম্ভীর স্বর।

ছিলেন। উইলসন মিল্টনটা খুব ভাল রকম পড়াতে পারতেন। আর মিল্টন-এর ছন্দেই মাইকেল পড়লে বেশ ভাল শোনায়; সেইজন্য স্বামীজীর 'মাইকেল' পড়া শুনতে এত ভাল লাগে।" সেই দিন এ বিষয়ে অনেক কথা চলিতে লাগিল।

বুদ্ধদেবচরিত লিখিবার কথা

একদিন কথা উঠিল যে, গিরিশ বাবু Sir Edwin Arnold-এর 'Light of Asia' থেকে বুদ্ধদেবচরিত লিখেছেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "নৃত্যগোপাল মহারাজ তখন গিরিশবাবুর সহিত খুব মেলামেশা করিতেন। নৃত্যগোপাল মহারাজ রামবাবুর বাটীতে থাকেন। একদিন গিরিশ বাবুকে বলিলেন যে, 'Light of Asia' বইখানা খুব ভাল হ'য়েছে; ওটা যদি নাটকে রূপান্তর ক'রতে পারেন ত বেশ হয়। গিরিশবাবু সেই বইখানা কিনে পড়েন ও নাটক রচনা করেন। কিন্তু বৈরাগ্যের গানগুলা, অনেকটা নরেনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ভাবটা লওয়া হইয়াছে এবং সেই গুলাই নাটকাকারে লেখা। কিন্তু নৃত্যগোপাল মহারাজ এই বই লিখিবার জন্য গিরিশবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

য়ুরোপ ও ভারতবর্ষে নাটক লিখিবার প্রথা

একদিন গিরিশ বাবু বলিতে লাগিলেন যে, য়ুরোপের নাটক দেখাচ্ছে যে, ভোগ-ইচ্ছা যাহাতে বাড়ে; একেবারে দুনিয়ার ভিতর ডুবিয়া থাকিবে, নীচ প্রবৃত্তি বা পশু প্রবৃত্তি

যাহাতে বৃদ্ধি হয়। লালসা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা (Lust and carnality) যাহাতে সংযত হয় এবং মনটা দুনিয়াদারী থেকে খুব উপর দিকে উঠে যাবে, এইটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের কাব্যের লক্ষণ। দুটো জাত ভাবগুলোকে দুটো দিক থেকে দেখেছে এবং সেই জন্যই দুটোর গতি দুদিকে হয়ে গেল এবং এই জন্যই দুটো জাতের কাব্যের তেমন মিল হয় না এবং এই থেকেই জাতের ভাবের পার্থক্য হয়। ভারতবর্ষ যে ভাবটাকে ঘৃণা ক'রে ত্যাগ ক'রেছে, য়ুরোপ সেটাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে বর্ণনা করেছে। গিরিশ বাবু সেদিন অতি অল্প কথায় উভয় জাতির কাব্যের ভাব বলিয়াছিলেন।

Orientals are precocious

একদিন কথা উঠিল যে, য়ুরোপ ও এসিয়ার লোকেরা কত বয়সে বেশ চালাক চতুর হয়। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, দেখ, Sir Alexander Grant-এর Xenophon বইতে একটা কথা বলেছে যে, 'The orientals are precocious'. কথাটা ঠিক। য়ুরোপের ছেলে মেয়ে গুলোকে দেখ ১৬, ১৮, ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যেন শিশু, বোকা, হাবা, কোন বিশেষ বুদ্ধিশুদ্ধি নাই ; তারপর পঁচিশ থেকে ওদের মাথা খোলে। কিন্তু আমাদের এসিয়াতে ১২।১৩ বৎসর থেকে বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং ১৬ বা ১৮ বৎসর বয়সে বেশ চালাক চতুর। বিশ বৎসরে পুরো অবস্থা—এই কথাটা

এসিয়ার অনেক জাতের ভিতর দেখা যায় এবং অনেক স্থলে ১৬।১৮ বৎসরের ছেলে লড়াই করেছে, রাজত্ব চালিয়েছে এবং বড় বড় কাজ করেছে। কিন্তু য়ুরোপে লোকের মাথাগুলো যেমন একটু বড় হ'লে খোলে, তেমনি অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচে, অনেকদিন পর্য্যন্ত মাথার শক্তি থাকে। কিন্তু এসিয়ার লোকগুলোর যেমন অতি অল্প বয়সে মাথা খোলে তেমনি বুড়ো না হতে হতেই মাথার তেজ কমে যায়, এরা একেবারেই অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে। এটা যে কিজন্য হয় ঠিক বলা যায় না। এটার বিষয় একটু ভেবে দেখা দরকার।

Persian-দের মদ্যপান

একদিন Cyrus II-এর বিষয় কথা উঠিল। Cyrus, গ্রীকদের চিঠি লিখেছে যে, সে তার ভাই, রাজা Darius-এর চেয়ে বেশী মদ খাইতে পারে এবং মদ খাইয়া ঠিক থাকে। তার অন্যান্য গুণের ভিতর এটাও যেন একটা বিশেষ গুণ। তখনকার পার্শিয়ানরা কি মদটাই না খেত। আমাদের বলরাম বাবাজীও ফেলা যান না। তারও ত বিশেষ গুণ হচ্ছে, 'মদ খাওয়া'। এক এক সময় মানুষের ভিতর কিরূপ গুণের পরিচয় হইত! মদ খাওয়াটাই যেন একটা বিশেষ গুণের চিহ্ন। সে দিন এসব বিষয়ে অনেক হাসিতামাসা চলিল।

পাহাড়ে গীতা পড়া

একদিন শরৎ মহারাজ দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,

"ওহে, যখন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম, তখন বড় আমাশা হ'লো। যা তা খাই, কখনও বা উপোস থাকি, খুব আমাশা ধরলো। খুব পেটের যন্ত্রণা, একদিন ত সেই পাহাড়ের ভিতর সমস্ত রাত বাহ্যে করতে লাগলুম—রাত্রি, অজানা স্থান, জলই বা কোথায় পাই, কাজেই বাহ্যে ক'রে অমনি পড়ে রইলাম। তারপর সকাল হ'লো; কি করি—গীতাখানা খুলে পড়তে লাগলাম, তারপর বেশ দিন হ'লে সেখান থেকে রওনা হ'লাম।" আমি বলিলাম, "তুমি অশুচি অবস্থায় গীতা ছুঁলে আর পড়লে, তুমি মহা অঘোরী, ম্লেচ্ছ; ছি! ছি! শুনলে ঘৃণা করে।" শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "ওহে, সে রকম অবস্থায় পড়লে আর কি শুচি অশুচি জ্ঞান থাকে? কোথায় বা জল আর কোথায় বা খাওয়া, কেবল পথে ঘুরে ঘুরে বেড়ান আর রাত্রি হ'লে এক জায়গায় পড়ে থাকা। সত্যই তখন মহা অঘোরী হ'য়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার কাছে শুচি অশুচি কিছুই ছিল না, সবই এক হ'য়ে গিয়েছিল।"

কৃচ্ছ্রসাধনে বিভিন্ন ভাব

"নিঃসম্বল হ'য়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালে দেখলাম, দুটো জিনিষ হয়—কতকগুলো লোককে দেখিলাম, কিছুদিন কষ্টে থেকে থেকে তাদের মনটা এত ছোট হয়ে যায় যে, আধটুকু এমন কি সিকিটুকুর জন্যও ঝগড়া করে। কোথায় ভগবান লাভ করতে যাবে, মনটাকে প্রশস্ত করবে, তা না হ'য়ে

মনটা একেবারে সংকীর্ণ পশুর মত ক'রে ফেলে। এ'র চেয়ে তাদের ঘরে থাকলে ভাল ছিল, তবু গরীব দুঃখীকে এক মুঠো চাল দিত। এটা অধিক লোকের ভিতর হয়। আর বাকী অল্প লোকের ভিতর, এই কষ্টের মধ্যে থেকে মনটা একেবারে উদার হয়ে যায়। কোন জিনিষে আর মমতা থাকে না, এমন কি দেহের মমতাও তাদের থাকে না; মহা বৈরাগ্যের ভাব আসে, এবং ভগবানের উপর একটা প্রগাঢ় নির্ভরতা হয়। এ রকম লোক বড় কম। এই কটাই টেঁকে যায় ও যথার্থ সাধু হয়।" শরৎ মহারাজ সেদিন বড় বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়া এই সব কথা বলিতে লাগিলেন।

Apocryphal Bible +

একদিন কথা উঠিল যে, যীশুর যেমন বারজন শিষ্য ছিল, সেই রকম আরও অনেক শিষ্য ছিল, সম্ভবতঃ বাহাত্তর জন।* অর্থাৎ তাহারা অন্তরঙ্গ না হইলেও বহিরঙ্গের ভিতর গণ্য হইত। কিন্তু তাহারা কেহই কিছু লিখিয়া যায় নাই। লেখকদের ভিতর আবার দেখিতেছি, দুইজন ত সাক্ষাৎ শিষ্য নয়; একজন পিটারের শিষ্য হইয়া লিখিতেছে, অপর এক জন পলের শিষ্য হইয়া লিখিতেছে।‡ যদিও যীশু জীবিতাবস্থায় দেশের ভিতর এক মহা আন্দোলন তুলিয়াছিলেন কিন্তু

* মতান্তরে এই শিষ্যদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন (বাইবেল, লুক ১০ দ্রষ্টব্য)। সঃ

‡ লুক পলের শিষ্য এবং মার্ক পিটারের শিষ্য।

দুই বা তিন জন ছাড়া অপর কেউ কেন তাঁর বিষয় লিখিয়া যাননি, এই কথা দু'এক দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল এবং যীশু সম্বন্ধে তখন যে সকল বই হাতে পাওয়া যাইত তাহার খোঁজ করা গেল। অবশেষে একখানি ছোট pamphlet-এর (পুস্তিকার আকৃতিতে) Apocryphal বা পরিত্যক্ত বাইবেল পাওয়া গিয়াছিল। পুস্তকখানি মান্দ্রাজে ছাপা।* তাহার গল্প প্রচলিত বাইবেলের গল্প হইতে পৃথক্। এখন যাহা স্মরণ হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, এই পরিত্যক্ত বাইবেলের যেন দু' একটি উপাখ্যান, যশোদা-নন্দন কৃষ্ণের উপাখ্যানের সহিত মিল আছে ; যথা—রাখাল বালকদিগকে বনফল খাওয়ান এবং শাণ্ডিল্য মুনির পাঠশালায় পড়িবার সময় গুরুমহাশয় যখন বেত মারিতে হাত তুলিয়াছিল তখন যেমন তার হাত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একবার পরিত্যক্ত বাইবেলে এই ভাবের দু' একটি গল্প দেখিয়াছিলাম। এই সকল কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজ এইরূপ অনুমান করিতে লাগিলেন যে, এক দেশের গল্প অপর দেশে চলিয়া গিয়া সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক এই পরিত্যক্ত বাইবেলের কথা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

প্রচলিত বাইবেল +

তারপর কথা উঠিল যে, প্রচলিত বাইবেল কি ভাবে

* Christian Tract Society কর্তৃক প্রকাশিত।

লোকে গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে শিষ্য প্রশিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ গ্রন্থ দেখিয়া উপদেশ বা যীশুর বিষয় চর্চ্চা প্রচলন ছিল না। তাঁহারা যে যার গুরু পরম্পরায় শ্রুতবাক্য লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। কিন্তু ২০০ বা ২৫০ বৎসরের পর গুরু পরম্পরায় শ্রুত বাক্য নানা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিল, এইজন্য সকলে মিলিত হইয়া এক সভা করিয়া মত সকল স্থির করা হইয়াছিল এবং ৩২৪ খৃষ্টাব্দে বা তৎসময়ে কনস্টানটিনোপলে কনস্টানটাইন এই সভা আহূত করেন এবং এই কয়খানাই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয় এবং অপর গ্রন্থ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে নানাস্থান হইতে বৃদ্ধ মহান্তসকল একত্রিত হইয়াছিল। যীশুর ঠিক পরের সময়কে Age of Apostles বা শিষ্যমণ্ডলীর সময় বলা হইত এবং তৎপরবর্ত্তী সময়কে Age of Fathers বা বাবাজীদিগের যুগ বলা হইত।

শরৎ মহারাজের সহিত এ বিষয়ের কথা ক্রমিক গভীর আলোচনায় পরিণত হইল এবং প্রসঙ্গও নানাভাবে চলিল। তারপর কথা উঠিল, এখন যেমন খৃষ্টান ধর্ম্মে ত্রিমূর্ত্তি আছে কিন্তু যীশুর শিষ্যেরা ইহুদী ছিল, উহাদের ভিতর ত্রিমূর্ত্তির কিরূপ ভাব ছিল? যদিও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল কিন্তু জাতিগত সমাজগত ভাব তাহাদের কি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিল? কারণ এই সকল সামাজিক আচার পদ্ধতি লইয়া পিটার ও পলের অনেক বচসা হয় এবং পল

প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিয়া যায়। ইহুদী ব্যতীত অপর কাহাকেও মণ্ডলীতে লওয়া যায় কিনা—ত্বক্-ছেদ (circumcision) রাখা যাইবে, না বন্ধ করা উচিত, ইত্যাদি। কারণ তৎকালে ইহুদী ছাড়া অপর কোন জাতি ত্বক্ছেদ করিত না এবং গ্রীকরা যখন যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা ত্বক্ছেদ করিতে বা ইহুদী আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, যথা—শুকর মাংস বর্জ্জন ইত্যাদি।

Arian controversy +

সম্ভবতঃ, যীশুর শিষ্যেরা এক ঈশ্বরই মানিত এবং আনুষঙ্গিক দুই মূর্ত্তি বা সংজ্ঞা তাহারা জানিত না। কালক্রমে ত্রিমূর্ত্তির ভাব ধর্ম্মকলেবরে প্রবেশ করিল। ইজিপ্ট দেশীয় Arius নামে এক ব্যক্তি একটি মত চালাইয়াছিলেন যে, শুধু ভগবানকেই মানিবে এবং 'সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ আত্মা' এ দুটা অনাবশ্যক। অবশ্য যীশু আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করা যাইতে পারে না। ভগবান, ভগবান; মানুষ—মানুষ। ইহাকে খৃষ্টান মণ্ডলীতে Arian controversy বা Arius-এর বিভিন্ন মত বলা হয়। কনস্টান্টিনোপলের ধর্ম্মমণ্ডলীতে (Nicene Council) এরিয়াসের মত পরিত্যক্ত হয় এবং ত্রিমূর্ত্তির ভাব গ্রহণ করা হয়; অর্থাৎ এরিয়াসের পরাজয় হয় এবং অপর দল বিজয়ী হয়। তদবধি এই ত্রিমূর্ত্তির ভাব খৃষ্টীয় ধর্ম্মের

অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কিন্তু প্রথম অবস্থায় এ বিষয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা * হইয়া গিয়াছিল।

আরও কথা উঠিল যে, আমেরিকাতে Unitarian সম্প্রদায় আছে, ‡ তাহারা কিন্তু 'সূনু' বা শুদ্ধাত্মাকে ভগবান স্থানীয় বলিয়া মানে না। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, কেশব বাবুর সমাজের সহিত আমেরিকার এই Unitiarian Christian-দের অনেক বিষয় মতের ঐক্য আছে এবং এইজন্য এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতর বিশেষ সৌহার্দ্য আছে। যা হোক, Unitarian ও Trinifarian সম্প্রদায় দুইটা পূর্ব্বকালে গঠিত হইয়াছিল।

Martyr বা শহীদ

একদিন কথা উঠিল যে, খৃষ্টান ধর্ম্মে বা ইহুদীধর্ম্মে দেখিতে পাই যে, অনেকে martyr হইয়া গিয়াছে। এই সব দেশের বা এই সব জাতির ভিতর একটা ধারণা আছে

---

* নাইসিয়াব মহামণ্ডলীব পূর্ব্বে, অ্যান্টিযকে ২৬৯ খৃষ্টাব্দে একটি ধর্ম্মসভা আহূত হয় এবং তথায় ত্রিমূর্ত্তির consubstantial ভাবটি পরিত্যক্ত হয়। (En. Br : Vol. 13. Page 671 দ্রষ্টব্য) সঃ

‡ F. W. Farrar-এর মতে উত্তবকালে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোলাণ্ডে এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে Unitarian সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইংলণ্ডে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের একটি গীর্জ্জাও স্থাপিত হয় (En. Br. Vol. 13 Page 671 দ্রষ্টব্য)। অবশ্য, আমেরিকার বাহিরে এই সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রতিষ্ঠা ; সঃ

যে, যে নূতন ধর্ম্ম প্রণয়ন করিবে তাহাকে মারিয়া ফেলা চাই এবং প্রণয়ন-কারীর অপঘাতে ভীষণ ভাবে মৃত্যু না হইলে এই সকল জাতির ভিতর ধর্ম্মপ্রচার বা ধর্ম্মের সার্থকতা হয় না। এ এক বড় বীভৎস ব্যাপার। এই সকল জাতির ভিতর ধর্ম্মের ভাবটা যেন লোহার পাঁচিল দিয়া ঘেরা। জাতগুলো অত্যন্ত fanatic। ধর্ম্মের ভিতর উদার ভাবটা একেবারেই নাই। রক্তপাত না করিলে ইহাদের যেন ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হয় না। কিন্তু আমাদের হিন্দুদিগের ভিতর দেখ, ধর্ম্মের বিষয়ে কত বিপরীত সম্প্রদায় রহিয়াছে কিন্তু সে জন্য কেউ ত কাহাকেও মারিয়া ফেলিতেছে না। এই সব জাতগুলো ধর্ম্মের ভিতর যে উদার ভাব আছে তাহা শিক্ষা করে নাই এবং ভাবিয়াও দেখে নাই। ইহারা ধর্ম্মটাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর রাখিয়াছে। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার ভিতর ইহাদের উদার ভাব আছে। আমাদের হিন্দুদের কি জান? ধর্ম্ম বা ইষ্ট বা উপাসনা বিষয়ে কারো কোন বাধা নাই। এক গ্রামেই বৈষ্ণব এবং শাক্ত, বিপরীত মতের লোক রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজে বিবাহ ও খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে বড় আঁটাআঁটি। এইজন্য Semitic-দিগের সহিত, অর্থাৎ আরব, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত হিন্দুদিগের একেবারে বিপরীত ভাব। দেখ দেখি, বাইবেলটা পড়ে, প্রথম পাতা থেকেই বলছে যে, যীশুকে মেরে ফেল, যীশুকে মের ফেল। যখন ছোট ছেলেটা

জন্মেছে তখন থেকে রব উঠলো, ও ছেলেটাকে মেরে ফেল, ওর সমান বয়সী ছেলেগুলোকে মেরে ফেল, যেন দেশে ও বয়সী ছেলে না থাকে। শেষকালে তাকে কাঠের গায়ে পেরেক ঠুকে মেরে ফেললে। কেন বাবা, না মেরে ফেললে কি ধর্ম্ম হয় না! এটা দেখে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি! আর ভাবছি ভাগ্যে হিন্দুদের ঘরে জন্মেছিলাম, ওদের ঘরে জন্মাইনি; তা হ'লে কি জানি বেঘোরে অপঘাত মৃত্যু হ'তো আর এমন সাধুগিরি করা চলতো না। তাহলে বলতাম থাকগে ভগবান, থাকগে ধর্ম্মকর্ম্ম, যে যার নিজের মামলা মিটিয়ে নিকগে। জাতগুলো অতি নিষ্ঠুর এইজন্য ওদের ধর্ম্ম ভাবগুলো এত নিষ্ঠুর। এইভাবে সেদিন শরৎ মহারাজ বলরাম বাবুর বাটীতে দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

Peter, Paul ও Thomas +

পূর্ব্বকথা হইবার পরদিন বা তার পরদিন শরৎ মহারাজ আবার কথা তুলিলেন যে, দেখ, যীশু বেচারী ত ধর্ম্মের জন্য বেঘোরে প্রাণটা দিলে, কিন্তু তার চেলাদের কি হ'লো? পিটার একটা বুড়ো, জেলেমালা, তার বয়েসটা তো খুব হয়েছিল, তারও বুড়োবয়সে অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল, শেষটা তাকেও মেরে ফেললে। রোমের পোপদের এত সম্মান কেন জান? ইহারা আদি মহান্ত—পিটার-এর গদীতে বসে এই জন্য ইহারা অপর মহান্ত বা Bishop-এর চেয়ে বেশী

সম্মান পায়, অর্থাৎ পিটার-এর গদীটা আদি গদী। যীশুর শিষ্য-পরম্পরায় এই গদী চলিয়া আসিতেছে।

তারপর সেণ্ট পলের কথা উঠিল। পল একজন মহাপণ্ডিত, মহাত্যাগী লোক ছিল। লোকটার কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝা যায়, লোকটা ঝাঁজাল রাগী লোক ছিল; আর নিজের গোঁ ভরে চলিত। কিন্তু তার প্রাণটা বড় ছিল; জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিল এবং দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে নিজের গুরুর নাম প্রচার করে বেড়িয়েছিল। "লোকটা কি ছিল জান? জোয়ান বয়সে একটা খুনে ছিল। এত প্রচণ্ড রাগী fanatic যে, যীশুর একটা শিষ্য ষ্টিফেনকে পাথর ছুঁড়ে ছুড়েঁ থেঁতলে মেরে ফেললে, আর রেগে যেন পাগল হয়ে উঠলো। যীশুর সমস্ত লোককে সদলবলে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হঠাৎ ভগবৎ দর্শন হয়ে মনটা একেবারে বদলে গেল। লোকটা পণ্ডিত ও তেজী ছিল এইজন্য আবার যখন যীশুর দলে এল তখন সে যীশুর হয়ে খুব কাজ করতে লাগল। বোধ হয়, পল যদি যীশুর ধর্ম্মে না জুটত তা হ'লে যীশুর ধর্ম্ম এমন প্রচার হ'ত না, হয়ত একেবারেই লোপ পেয়ে যেত। যা' হোক যীশুর ধর্ম্মের বহুল প্রচার পলই করেছিল, কিন্তু এ লোকটারও শেষকালে অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল।"

টমাস ব'লে যীশুর একটা শিষ্য ছিল। বোধ হচ্ছে, সে একটু বয়সে ছোট ও বোকা ছিল। সকলে তাকে নিয়ে একটু ব্যঙ্গ করিত। কোন কোন পুস্তকে একটু পাওয়া যায়

যে, সে হেঁটে হেঁটে প্যালেস্টাইন থেকে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং সেখানে অনেক শিষ্য করিয়াছিল। তার পর ফিরিয়া যাইবার সময় পাঞ্জাব অঞ্চলের কোন স্থানে নাকি মারা যায়। এইত হিসাব ক'রে দেখছি প্রথম খৃষ্টানদের ভিতর অনেকগুলোরই অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু লোকগুলো দমে যায় নি, টেনে আঁকড়ে পড়েছিল সেইজন্য ঐ সম্প্রদায়টা পরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যা'হোক এত রক্তপাত হিন্দুদের ভাল লাগে না। ধর্ম্ম হ'চ্ছে শান্তি পাবার জন্য, এত অশান্তির দরকার কি ?

Holy Communion

কিছুদিন পরে আর একবার কথা উঠিল যে, দেখ, যীশুর যে ভোগ দেয়, তাতে মন্ত্র হ'চ্ছে রুটিখানা যীশুর মাংস আর মদটা হ'চ্ছে যীশুর রক্ত, সেইটা শিষ্য বা ভক্তদের খেতে বলে। যীশুর শেষ ভোজন বা Last supper-এর কথা পড়েছিলাম, তাতে খুব অদ্বৈতবাদের কথা রহিয়াছে। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, যীশু শেষ অবস্থায় একেবারে অদ্বৈতবাদী হইয়াছিল। নিজেরই ভিতর ব্রহ্ম দেখিতেছে এবং ব্রহ্মের ভিতর নিজেকে দেখিতেছে। এ অংশটা আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু বাবু, খাওয়াদাওয়ার কথাতে আমার গা শিউরে উঠলো, ওটা বড় বিটকেল লেগেছিল। শরৎ মহারাজ এইসব কথা কহিলে

আমি বলিতে লাগিলাম যে, ওটা ভাষা দেখে মানে করা, ঠিক নয়; ওটার মানে হ'চ্ছে যে, যীশুর ভাব বা যীশুর শক্তি ভক্তের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করুক, শিষ্যেরা তদ্রূপ হউক। যেমন পানাহার করিলে শরীর পুষ্ট হয় সেইরূপ এই যীশুর ভোগ আহার করিয়া শিষ্যের মন যীশুর ভাবে পরিপুষ্ট হউক। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "ওহে, সে কথা স্বতন্ত্র, সে হিন্দুদের ভিতরও আছে, যেমন গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করা, গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা। তবে গুরুর মাংস খাবো, আর গুরুর রক্ত পান করবো, এ যে বড় বীভৎস কথা; শুনলে গা'টা ঘিনঘিন ক'রে ওঠে। তার উপর, তায় আবার গুরুর, যাকে এত শ্রদ্ধা ভক্তি করা যায় তার রক্ত মাংস খাওয়া— বড় বীভৎস কথা, এ ভাবটা বড় কদর্য্য। হিন্দুদের কাছে এ সব ভাব বড় revolting. ইহুদীদের জিনিষ ইহুদীদের কাছেই ভাল। হিন্দুদের কাছে এ সবগুলো ভাল না, তবে যীশু একজন মহাপণ্ডিত, সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, অবশ্য তাঁকে খুব ভক্তি ক'রে প্রণাম করি। কিন্তু হিন্দুদের ঘরে এই ইহুদী আচার একেবারেই চলে না।" কথা উঠিল যে, এক গ্লাস মদ ও একটু রুটি যীশুকে ভোগ দেওয়া হয়। প্রথমে এটা সাধারণ জিনিষ থাকে, কিন্তু মন্ত্র প'ড়ে নিবেদন ক'রে দিলেই এটার রূপ পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ রুটিটা মাংসে পরিণত হয় এবং মদটা রক্তে পরিণত হয়। মধ্যযুগের খৃষ্টান-দিগের মধ্যে মহা মতদ্বৈধ ছিল। এক সম্প্রদায় বলিত, জিনিষ

নিবেদন করিলেও যাহা ছিল তাহাই থাকে, কেবল অনুকল্প করিতে হয়। আর এক সম্প্রদায় বলিত যে, না, একেবারেই বদলাইয়া যায়। এ নিয়ে দু'দলে মহা ঝগড়া ছিল। দু' দলই মহা গোঁড়া, দু'দলেরই মহা জিদ, এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত হ'য়েছিল। তবে অনুকল্পটা খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত হইলে ত মহা বিপদ। কাঁচা রক্ত কে খায়রে বাপ! আমাদের ভিতর দেখ, অনেক জিনিষ আমরা মন্ত্রপূত ক'রে অনুকল্প ক'রে নিচ্ছি, কিন্তু কখনও বলি নি সেটা পরিবর্ত্তিত হ'লো। এইখানেই খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ পড়ছে।

Essene +

একদিন Essene বা সন্ন্যাসীদের কথা উঠিল। শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "দেখ, Moses-এর বইতে বা তার পরে যে ক'জন ইহুদীদের সিদ্ধপুরুষ হ'য়েছে, তাদের সন্ন্যাসধর্ম্মের উপর তত জোর নেই; গৃহী-সাধক এই ভাব রয়েছে। কিন্তু যীশুর কিছু আগে থেকে Essene বা সন্ন্যাসীদের খুব উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা কঠোর সন্ন্যাসী ছিল। অনেকে গেরুয়া কাপড় পরিত, এবং কম্বলের একটা লম্বা জামা গায়ের উপরে থাকিত। এই Essene ভাবটা প্যালেস্টাইন পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিল এবং তাহারাই ইহুদীদিগের ভিতর এই সন্ন্যাস-ভাবটা ঢুকাইয়াছিল; কারণ পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ছাড়া অপর কোন দেশে সন্ন্যাসের ভাব ছিল না। এটা

শুধু খাঁটি ভারতের ভাব। অপর সব দেশে দেখতে পাচ্ছি লোকে 'বে'থা' ক'রছে, সংসার ক'রছে: কিন্তু সংসার ত্যাগ ক'রে ভগবানের উপাসনা করা, শুধু ভারতবর্ষের ভাব। আর প্যালেস্টাইনে ঐ Essene-দের হুড়াহুড়ি হওয়ায় যীশুর ভিতর এই ভাবটা প্রবেশ করেছিল। কারণ যীশুর অনেক কথা-বার্ত্তায় দেখা যাচ্ছে যে, সেগুলি ভারতবর্ষীয় ভাব, ইহুদী ভাবের নয়। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম অবস্থায় যীশু কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল এবং তাহাদের প্রভাব যীশুর ভিতর খুব প্রবেশ করেছিল। দেখছ না, কথাবার্ত্তা অনেকটা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত। যদিও স্পষ্ট প্রমাণ নাই কিন্তু গৌণ প্রমাণ বেশ রয়েছে। দেখ, একখানা বইতে * দেখলাম যে, যীশুর কাপড় গেরুয়া ছিল; অর্থাৎ উপরকার চাপকানটার ভিতর সন্ন্যাসীদের চিহ্নটা রাখবার জন্য ভিতরে একটা জামা পরিত। গলার কাছে জামাটা খানিকটা বাহির হইয়া থাকিত। এ বাবা, সন্ন্যাসী না হইয়া যায় না!"

Locust সম্বন্ধে স্বামিজীর মত

বাইবেলে লেখা আছে যে, John, Dead Sea-র নিকট-বর্ত্তী স্থানে থাকিতেন এবং তাঁহার আহার্য্য ছিল locust এবং wild honey, অর্থাৎ পঙ্গপাল বা শলভ এবং বন্যমধু।

* Cunningham Geikie-র গ্রন্থ।

স্বামিজী একদিন এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ইহুদীদিগের পঙ্গপাল খাওয়া প্রথা ছিল, অর্থাৎ পঙ্গপাল তাহাদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু নহে। আহার্য্য দ্রব্যের দুটি ভাগ আছে, যথা মেধ্য ও অমেধ্য। পঙ্গপাল মেধার ভিতর পড়ে। বেলুচিস্থানের লোকেরা অদ্যাপি অতি আদর করিয়া পঙ্গপাল বা শলভ আহার করিয়া থাকে। আমি (বর্ত্তমান লেখক) এক সময়ে বেলুচিদিগের সহিত ছিলাম এবং তাহাদের পঙ্গপাল খাইতে দেখিয়াছি।

জন্ ও যীশু +

একদিন John the Baptist-এর কথা উঠিল। জন্ দূর সম্পর্কে যীশুর মাসতুত ভাই, অর্থাৎ মেরীর কোন দূরসম্পর্কীয় ভগ্নীর ছেলে। জন্ যীশু হইতে মাস কয়েকের বড়। কথা উঠিল, ইহুদীদিগের baptism প্রথা ছিল না। জন্ এ প্রথা কোথা হইতে পাইল? জন্ বিবাহ করে নাই, কঠোর সাধকের ন্যায় মরুভূমি বা একান্ত প্রদেশে অনেক সময় বাস করিত এবং মদ বা মাংস আহার করিত না। অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তাহাতে এই বোঝা গেল যে, যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুক প্যালেস্টাইন অঞ্চলে বাস করিয়াছিল এবং শিষ্যপরম্পরায় এক সন্ন্যাসীর দল গঠন করিয়াছিল, সেই সময়ে সম্ভবতঃ জন্ কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই জন্যই অনেক ভারতীয়

আচার লক্ষিত হইতেছে। যীশু এই ভারতীয় ভাবাপন্ন জন্ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য যীশুর ভিতর অনেক ভারতীয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যীশু আপনাকে Son of man বা নরসূনু বলিয়া পরিচয় দিতেন।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ মনু ১-১০।

ভগবানকে পিতা এবং 'Father which art in heaven' বা দ্যৌষ্-পিতা এইরূপ শব্দ ব্যবহৃত করিতেন। ভগবানকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা ইহুদীদিগের মধ্যে বিষম বিপরীত ভাব। যীশু শেষ সময়ে অনেক অদ্বৈতবাদের কথা কহিয়াছিলেন, যথা—I and my faiher are the same. Whosoever seeth the son seeth the father. এই সকল ভাব সমস্তই খাঁটি ভারতীয় এবং ইহুদী ধর্ম্মের বিরোধী ভাব। এই সকল উক্তির জন্য যীশুকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত হইতে অনেকটা বোঝা যায় যে, যীশু যুবা অবস্থায় কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট হইতে এই সব ভাব পাইয়াছিলেন এবং এইভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যে, সন্ন্যাসীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এটা বেশ বুঝা যায়। সেইদিন এ বিষয়ে শরৎ মহারাজের সহিত অনেক কথা হইয়াছিল।

Passion Play

বলরাম বাবুর বড় ঘরটিতে পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের কাছে শরৎ মহারাজ শুইয়া আছেন, আমি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। তখন বেলা ৩টা। শরৎ মহারাজ বাইবেল হাতে করিয়া পড়িতেছিলেন। ঘরে ঢুকিতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, Passion শব্দটার মানে কি? এটা প্রায় ব্যবহার করেছে।" আমি বলিলাম, "Passion মানে suffering বা যন্ত্রণাভোগ।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটাই ধরলে ঠিক মানে হয়।" তারপর কথা উঠিল,—লীলা অভিনয়। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বুদ্ধের জীবন-কাহিনী লইয়া যাত্রা অভিনয় করিত। এক একদিন এক একটা বিষয় লইত এবং সেই বিষয়ে পালা বাঁধিত এবং পরে সন্ন্যাসীরা নানারূপে সাজিয়া সেই পালা অভিনয় করিত। এই অভিনয় পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদের ভিতর আবদ্ধ ছিল এবং পরে সন্ন্যাসীদের আশ্রম হইতে ইহা দেশের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা যীশুর জীবনের কোন ঘটনা লইয়া নিজেরা নানারূপে সাজিয়া অভিনয় করিত। ইহাকে Passion play বলে। এই অভিনয় ধর্ম্মমূলক ছিল এবং যীশুর জীবনের নানা ঘটনা ও নানা ভাব সাধারণের ভিতর বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত। তখন সন্ন্যাসী ছাড়া গৃহী লোকেরা বাইবেল পড়িতে বা ছুঁইতে পারিত না। কেবল জনকতক সন্ন্যাসী এই গ্রন্থ পড়িত এবং

এই বিষয়ে জানিত এবং তাহাও ছিল গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়। সাধারণ লোক কেবল মুখে মুখে গল্প কাহিনী শুনিত। যাহা হউক, এই Passion play বৌদ্ধ যুগের সন্ন্যাসীরা প্রথম প্রচলন করিয়াছিল।

আমি যখন পারস্যে ছিলাম তখন ইমাম হোসেনের কারবালার লড়াই ও মৃত্যু উপলক্ষে উপাখ্যান লইয়া নানা প্রকার ভক্তিমূলক যাত্রা দেখিতাম। পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে স্ত্রীলোকের অর্থাৎ শহর-বানুর (Shaher Banu) ও সেকিনার (Shakina) পালাগান করিত। অতি ভক্তি-সহকারে লোকেরা এই সব পালাগান শুনিতে যাইত এবং অভিনয়ও অতি সুন্দর হইত। সকলেই ভক্তিভরে রোদন করিত। প্রাচীন বৌদ্ধ প্রথা এইরূপে নানা দেশে নানা রূপ ও নাম ধারণ করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যীশু ও যীশুর ধর্ম্ম

একদিন শরৎ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওহে বাইবেলটা ত সমস্ত পড়িলাম এবং ইহাতে বুঝিলাম যে, যীশু একজন ঈশ্বরপ্রেমিক সিদ্ধ মহাপুরুষ। যীশুর প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, কারণ তিনি সাধু, ত্যাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ ; কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মটা ভারতবর্ষে চালান যায় না। কারণ খৃষ্টান ধর্ম্মটা হ'চ্ছে কতকগুলো বিদেশী আচারপদ্ধতি, যেগুলো আমাদের আচারপদ্ধতি হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের।

খৃষ্টান ধর্ম্ম এ দেশে চালান হ'তে পারে না। আর ইহুদীরা যে বলে তারা 'chosen people of God,' তা ভগবান কি এতই আহাম্মক ছিল যে, গোটাকতক ইহুদীর জন্যই কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে গেল আর পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের জন্য তার একটু মন চঞ্চল হ'ল না? একি কথা রে বাপ! আর ওরা যে বলে সিদ্ধ মহাপুরুষ (Prophet) শুধু ইহুদীদের মধ্যে জন্মেছে অপর দেশে জন্মায় নি, এটা আমি মানতে চাই না। আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষেতেও সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্মেছিল এবং তাহাদের সংখ্যা এখানেই খুব বেশী। তবে ইহুদীদিগের ভিতর একজন খুব উন্নত পুরুষ জন্মেছিল এবং সে যীশু, এ কথা আমি মানি। ভগবানের রাজ্যে একচেটেমি নেই।" সেইদিন এই সকল কথা বলিতে বলিতে শরৎ মহারাজ একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন।

Crusade +

শরৎ মহারাজ একদিন বলিলেন, "দেখ, এই ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টানরা কি না করেছে, কত লক্ষ নরহত্যা করেছে। যদি বলে ডাকাতি কর্ত্তে যাবে, সাদা কথা, কোন দোষ নেই; যদি বলে রাজ্য বিস্তার কর্ত্তে যাবে, কোন দোষ নেই, কিন্তু যীশুর মহিমা প্রচারের জন্য নরহত্যা কর্ত্তে যাওয়া একেবারেই অসহ্য। এই crusade উপলক্ষে কত লক্ষ লক্ষ লোককে প্যালেস্টাইন এবং জেরুসালেমে মেরে ফেলা হয়েছে তার

ইয়ত্তা নেই। রক্তের নদী ব'য়ে গেছে। Crusade-এর ব্যাপার যখন পড়ি তখন গা'টা শিউরে ওঠে। যে নিরীহ যীশু নিজের প্রাণটা দিলে. তারই শিষ্যেরা রক্তেতে মাটি ভিজিয়ে দিল। কি বিপরীত কার্য্য! যদি crusade-এর ইতিহাস একবার উল্টে দেখ, দেখবে কি বীভৎস ব্যাপার। আর Pope গুলোই বা কি হইয়া উঠিল। বিলাসিতার চূড়ান্ত করিতে লাগিল। স্বর্গে চিঠি লিখিয়া দিল; সেই সকল চিঠি অনেক টাকা দরে বিক্রয় হইতে লাগিল (Sale of Indulgence)। যাহার উপর ক্রোধ হইল তাহাকে তাড়াতাড়ি নরকে পাঠাইয়া দিল; যেন, স্বর্গ আর নরকটা পোপের বাটীর খানসামাদের ঘর। নিজের সাধন ভজন তপস্যা ওসব কিছু নয়, শুধু বড় মহান্তকে কিছু টাকা দিলেই সব মাপ। তাইত Luther-এর Reformation উঠিল।" একজন বলিলেন, "Pope Leo X-এর ছেলে ছিল, তার নাম Ceasar Borgia, এই ত মহান্তের ছেলে রয়েছে।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "আরে ছেড়ে দাও, মহান্তদের চিরকাল ও সব হ'য়ে থাকে। রোমের পোপরা (Pope of Rome) Peter-এর বড় গদীতে বসিয়াছিল বলিয়া তাহারা অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিল।"

যীশুর জন্মমাস +

একবার কথা উঠিল যে, যীশু কোন্ মাসে জন্মিয়াছিল। Christmas ত' হয় শীতকালে। কিন্তু জন্মের সময় বাইবেলেতে

কোন বরফ পড়া বা কিছুর উল্লেখ ক'চ্ছে না, বরং মৃত্যুর সময়ে ঠাণ্ডার কথা পাওয়া যাচ্ছে। মৃত্যুর সময় পিটার আগুনের কাছে ব'সে তাপ নিচ্ছিল। জন্মসময়ের উপাখ্যান পড়িলে গরমীকালে যীশু জন্মেছিল এটা বেশ বুঝা যায়।

তারপর কথা চলিতে লাগিল যে, Saxon এবং আরও অনেক জংলী জাত খৃষ্টান হইল। তাহাদের জাতীয় উৎসবের নাম হইতেছে 'Festivity of the rising sun' বা উত্তরায়ণ উৎসব। খৃষ্টান হইবার পরেও তাহারা এই উৎসব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিল। এখন Pope Gregory I বুঝিল যে, যদি তাহাদের জাতীয় উৎসব বন্ধ করা যায় তাহা হইলে জংলীরা সব চলিয়া যাইবে, Christian ধর্ম্ম মানিবে না এবং রোম-রাজ্যের পরম শত্রু হইবে। আবার ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে Synod of Whitby বসিল এবং St. Hilda নামক রমণী সভানেত্রী হইলেন। সেই সভায় এই স্থির হইল যে, যীশুর জন্ম বা আবির্ভাব উৎসব Saxon বা জংলী জার্ম্মানদিগের সহিত মিশাইয়া দাও এবং শীতকালে যীশুর আবির্ভাব উৎসব কর। তদবধি শীতকালে আবির্ভাব উৎসব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু Scotch বা Presbytarian, তাহাদের ভিতর কেহ কেহ গরমীকালে যীশুর জন্মোৎসব সামান্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু যীশুর জন্ম গরমকালে হইয়াছিল, শীত কালে নহে। Good Friday হ'চ্ছে যীশুর তিরোভাব উৎসব এবং Christmas হ'চ্ছে আবির্ভাব বা জন্মোৎসব।

যীশুর জন্মবৎসর

একদিন কথা উঠিল, যীশুর জন্ম কোন্ সালে হইয়াছিল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ইহা ঠিক হইল যে, প্রথম ত যীশুর শিষ্যেরা সকলেই জেলেমালা ছিল, লেখাপড়ার ধার ধারিত না। দ্বিতীয়তঃ প্রাণের দায়ে তাহারা লুকিয়ে পালিয়ে যেত। ২০০ বা ২৫০ বৎসর পর যীশুর ধর্ম্ম, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন তাহারা যীশুর জন্মগণনা করার প্রয়াস পাইল। পূর্ব্বে রোম নগরে রোম-সহর নির্ম্মাণ হিসাবে বৎসর গণনা করা হইত। কিন্তু কয়েক শত বৎসর পরে যখন যীশুর জন্ম-সময় গণনা করিয়া বৎসর নির্দ্ধারিত করা হইল তখন অনবধান-বশতঃ বৎসর গণনায় একটু ভ্রান্তি হইয়াছিল এবং তাহাতে পাঁচ বৎসর সময় পিছাইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে research গ্রন্থ বাহির হইতেছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যীশুর জন্ম-বৎসর গণনায় পাঁচ বৎসর সময় পিছাইয়া ধরা হইয়াছে। তবে সাধারণ লোক এটা জানে না এবং জানিলেও বিশেষ উপকার হইবে না। উদ্দেশ্য—কাগজ পত্রে একটা হিসাব রাখা, তাহাতে দু' এক বৎসরের এদিক ওদিকে কিছু আসিয়া যায় না। ঐতিহাসিক গভীর তত্ত্ব লইয়া জগতের কাজকর্ম্ম চলে না।

শশীমহারাজের ভাগিনেয়

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে দিনকতক একটি ছেলে অবস্থান করিয়াছিল। একদিন তাহার পরিচয় লইয়া জানা গেল যে,

সে শশী মহারাজের ভাগিনেয়। শরৎ মহারাজ মনে মনে ছেলেটির উপর একটু বিরক্ত ছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। সকলে অনুরোধ করায় ছেলেটিকে দিনকতক থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেটি আলমবাজার মঠে দিনকতক থাকিবার পর সকলেই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। ছেলেটি সখীভাবের লোক ছিল। তাহার হাত-পা নাড়া, কথা কহা, দাঁড়ান সমস্তই মেয়েলী ধাঁচের ছিল। শরৎ মহারাজ এই ছেলেটির সহিত কথা কহিতেন না। একদিন তাহার দাঁড়ান, হাবভাব, কথা কহা শশী মহারাজের সম্মুখে পড়িয়া গেল ; এই ত শশী মহারাজ রাগিয়া গালমন্দ করিয়া ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিলেন। সেই পর্য্যন্ত ছেলেটির আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

সতীশ মুখার্জ্জি

এই সময় সতীশ মুখার্জ্জি নামক এক ব্যক্তি আসিতে লাগিলেন। ইনি পরে 'Dawn' নামক মাসিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। অল্প দিনেই আনাগোনাতে সতীশ মুখার্জ্জি শরৎ মহারাজের বড় অনুগত হইয়া পড়িলেন। সতীশ মুখার্জ্জির সহিত শরৎ মহারাজ নানা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। অনেক সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা এবং মাঝে মাঝে Political Economyর কথাও চলিত। সতীশ মুখার্জ্জির সহিত বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা হইয়াছিল এবং সতীশ মুখার্জ্জি

শরৎ মহারাজকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অনেক সময় ধ্যান জপের কথা হইত। কিন্তু ইং ১৮৯৬ সাল হইতে আর সতীশ মুখার্জ্জির সহিত বিশেষ মেলামেশা হয় নাই।

গঙ্গাধর মহারাজের সহিত কথা

গঙ্গাধর মহারাজ রাজপুতানা ও অপর স্থানে কয়েক বৎসর ছিলেন। পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। তিনি বাগবাজারেই বেশী থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে আলমবাজার মঠে যাইতেন। শরৎ মহারাজ বালকৃস্বভাব গঙ্গাধর মহারাজকে লইয়া মাঝে মাঝে হাসিতামাসা করিতেন এবং কখনও বা উচ্চ কথাও কহিতেন। গঙ্গাধর মহারাজকে একটু চা খাওয়াইয়া তিব্বতের কথা তুলিলেই তিনি অনবরত তিব্বতের কথা বলিয়া যাইতেন। গঙ্গাধর মহারাজ বলিতেন যে, তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন ভাই, ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করে না। সব কয়জন মিলিয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করে এবং সন্তানগণ প্রথম বাপ, দ্বিতীয় বাপ এবং তৃতীয় বাপ বলিয়া সম্বোধন করে। তিব্বতের খাওয়ার বিষয় বলিতেন যে, সে দেশে এত ভাত বা রুটি খাওয়ার প্রচলন নাই। দেশে আহার্য্য সামগ্রী অল্প, এইজন্য তাহারা তরল জিনিষ বেশী করিয়া খাইয়া থাকে। একটা হাঁড়িতে জল দেয়, তাতে Brick Tea বা জমাটকরা চা খানিকটা দেয়, তারপর শুকনা মাংসের গুঁড়া কতকটা দেয়, তারপর তাতে আঁজলা করে ছাতু দেয়। যখন সবটা বেশ টগবগ করে ফুটে ওঠে তখন কতকটা মাখন দেয়

এবং নামাইয়া লয়। ঐ মণ্ড তারা কাঠের খুরো দেওয়া বাটি করিয়া আহার করে। এই তাহাদের সাধারণ খাদ্য।

তিব্বতীরা অতিশয় চা পান করে, এইজন্য তাহারা যে স্থানেই যায় হাতে করিয়া একটা জল গরম করিবার পাত্র লইয়া যায়। এই পাত্রকে 'সামাবার' বলে। যেখানে বসিবে ঐ সামাবারে একটু জল গরম করিয়া চা প্রস্তুত করিবে এবং সেটুকু পান করিয়া পুনরায় হাঁটা সুরু করিবে। আমরা হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "একি গোঁসাইঠাকুরের গাড়ু হাতে করিয়া যাওয়া।" গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন যে, হাঁ সেই ক্লাসই বটে। এই চা'টা ভারতবর্ষ বা চীনদেশের মত আলগা হয় না। চা-পাতাগুলো একটা বড় ছাঁচে ফেলে টিপেছে, চাপুনিতে চা-গুলো জমে জমে একখানা বড় ইট বা চৌকো পাথরের মত হ'য়ে গেছে। যখন আবশ্যক হয় খানিকটা কাটিয়া লইয়া হাতে গুঁড়াইয়া সিদ্ধ করে। চা-পাতাগুলোও ফেলে না, সেগুলোও ছাতুর সহিত সিদ্ধ করিয়া খাইয়া লয়।

এইসব কথা হইতেছে, গঙ্গাধর মহারাজ হর্ষিত ও উত্তেজিত হইয়া বড় ঘরটিতে পায়চারি করিতেছেন এবং তিব্বতী গান গাহিতেছেন। খানিক পরে গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন— "শোন হে শরৎ, এক লজ্জার কথা শোন। আমাকে তারা বালক দেখে খুব যত্ন ক'রে রাখলে, বেশ খাওয়াদাওয়া। কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই আমার উপর বড় উৎপাত করত, সে দুর্গতির কথা আর কি বলবো! তিব্বতদেশে যদি কাহারও ঘরের ভিতর বসিয়া

বায়ু নিঃসরণ হয় তাহা হইলেই ঘরের সব জিনিষ অশুচি হইয়া যায়। তাহারা বলিত যে, ভারতবর্ষীয় লোকের বায়ু-নিঃসরণ একটা ব্যামো আছে। এইজন্য সন্ধ্যা হইলেই আমাকে ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া এক পাহাড়ের উপর বসাইয়া বলিত, 'পেট পরিষ্কার করে ঘরে ফিরো'। সে এক মহা বিপদ! সন্ধ্যার সময় ফাঁকা এক পাহাড়ে ব'সে কেবল কোঁৎ দিতে হ'ত, যদি পেটে কিছু থাকে ত বেরিয়ে যাবে। তারপর ঘরে ফিরে আসতাম। তবে সে দেশ বড় ঠাণ্ডা বলিয়া জলশৌচ করিবার প্রথা নাই, টুকরা টুকরা পাথর দিয়া শৌচ করিতে হয়। তাহারা সন্ধ্যার সময় আমার বড় দুর্গতি করিত!" তিব্বত সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেন, তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। কথার ছল ধরিয়া গঙ্গাধর মহারাজের সহিত শরৎ মহারাজ তামাসা করিতেন। কথা অনেকই হইত, এবং সে সব তিব্বত-ভ্রমণের। এস্থলে অপ্রয়োজন বোধে দেওয়া হইল না।

লাটু মহারাজের সহিত হাসিতামাসা

আলমবাজার মঠের সময় লাটু মহারাজ কলিকাতায় থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে আলমবাজার মঠে যাইতেন। এই সময়ে লাটু মহারাজের মনটা উদ্ভ্রান্তের মত হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ লাটু মহারাজের মনকে চাঙ্গা করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার সহিত হাসিতামাসা করিতেন। এই সময়ে শরৎ মহারাজের বেশ একটা প্রবীণতার ভাব আসিয়াছিল এবং সকলকে গুছিয়ে নিয়ে এক

সঙ্গে থাকা তাঁহার একটা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। কারণ অধিকাংশ লোক এই সময়ে বাহিরে ছিল এবং রাখাল মহারাজ তখন একটি লাজুক বালকের ন্যায় ছিল। রাখাল মহারাজের যে ভবিষ্যতে এত প্রখর বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল এ সময়ে তাহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

চা খাইতে বসিয়া কথা

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বরাহনগর মঠে যেরূপ অসচ্ছল অবস্থা ছিল, আলমবাজার মঠে সেরূপ রহিল না। হাওয়া যেন কিছু ফিরিল। ঠাকুরের ভোগ রাত্রিবেলায় কয়েকখানা লুচি ও কিছু সুজির পায়স হইত। শশী মহারাজ একখানা লুচি ছিঁড়িয়া খাইবার সময় প্রসাদ হিসাবে একটু একটু দিতেন এবং বাকি লুচি প্রাতঃকালে চা খাইবার সময় ভাগ করিয়া দিতেন। এই চা খাওয়ার কথাটা একটু বিশেষ স্মরণ রাখিবার জিনিষ। সকলেই রুক্ষ চা লইয়া বাটিতে ঢালিয়া খাইতে সুরু করিলে গোল হইয়া বসিয়া কথা আরম্ভ হইত। নানা শাস্ত্র, নানা দেশের প্রথা, নানা দর্শনের কথা লইয়া চর্চ্চা হইত; এবং কথাটা যাহাতে ভালরূপ জমিতে পারে সেইজন্য দুইটা দল হইত। দুই দলই নিজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য খুব তর্কযুক্তি দর্শাইত এবং নানা গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া নিজের মত সমর্থন করিত। এক একদিন সকাল হইতে বেলা ১০।১০॥টা পর্য্যন্ত এই তর্ক চলিত।

ক্রমে সকলেই আসিয়া যোগ দিত এবং বিচারটা বেশ জোর চলিত, এবং বিচার ঐ দিন না হইলে তার পরদিন এমন কি তৃতীয় দিনও সেই বিচার চলিত। কিন্তু কথা কহিবার সময় পরস্পরে বেশ সম্মান করিয়া এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া কথা কহিত এবং অপরের নিকট হইতে যে, একটা নূতন জিনিষ শিক্ষা করিব, এইটাই ছিল উদ্দেশ্য। তর্কের উদ্দেশ্যে তর্ক করা নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যে তর্ক। যদি তখনকার সেই সমস্ত কথা লিখিয়া রাখা হইত এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইত, জগতে অনেক গভীর ও নূতন সত্য প্রকাশ পাইত। কিন্তু তখন সে সকল কথার বিশেষ মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য সে সকল কথা লিখিয়া রাখা হয় নাই। যাহা হউক, সে সকল বিষয়ে একটা আনন্দস্মৃতি রহিয়া গিয়াছে।

গিরিশ বাবুর কাছে থাকা

বরাহনগর মঠের মাঝামাঝি সময় নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ১৮৯৭ খৃঃ আলমবাজার মঠের সময় পুনরায় বাংলা দেশে ফিরিয়া আসেন। শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গ না পাওয়ায় শরৎ মহারাজ অনেক সময় গিরিশ বাবুর বাটী যাইতেন এবং গিরিশ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, এবং গিরিশ বাবুও শরৎ মহারাজকে পাইলে মনের কথা কহিয়া

সুখী হইতেন। গিরিশ বাবু অনেক সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, ইতিহাসের কথা, সায়েন্সের কথা এবং Father Latount-র (লাফোঁ) কথা বলিতেন। শরৎ মহারাজ, আমি এবং আরও অনেক লোক বিকেলবেলা গিরিশ বাবুর বাটীতে চা খাইতে যাইতাম এবং সেই সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গিরিশ বাবুর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইত। সমস্ত কথা এখন স্মরণ নাই, কিন্তু অনেক উচ্চভাবের কথা হইত; এবং সেই সকল আলোচনায় অনেকের উপকার হইত। গিরিশ বাবু কেবল থিয়েটারের লোক এবং নাটক লিখিতে পারেন, এরূপ ছিলেন না। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভা ছিল।

চণ্ডীপাঠ

শরৎ মহারাজ অতি সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতে পারিতেন। তাঁহার সঙ্গীতে কিছু অভ্যাস ছিল এবং তাহার সহিত ছন্দের যতি রাখিয়া ভক্তিপূর্ণ ভাবে অতি সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেন। এই সময়ে তিনি বেদান্ত, উপনিষদাদি অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। রীতিমত সাধনা, তপস্যা ও অধ্যয়ন সবই একসঙ্গে চলিয়াছিল, অর্থাৎ নিজেকে তৈয়ারী করিবার জন্য সকল প্রকার উপকরণই তিনি সঞ্চয় করিতেন। সেই তপস্যার ফলে ভবিষ্যতে তিনি আমেরিকাতে ও ভারত-বর্ষে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

জপধ্যান করা এবং দিনে জপধ্যান, অধ্যয়ন ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্য করিতেন। এই সময়ে আলমবাজার মঠে বাহিরের কোন লোককে আসিতে দেওয়া হইত না। সকলে এক মন, এক প্রাণ হইয়া তপস্যা করিতেন এবং অধ্যয়ন, তপস্যার একটা অঙ্গ ছিল। শরৎ মহারাজ এক এক সময় হাসিয়া বলিতেন, "কি বাবা! এ হ'লো কি? বাড়ী-ঘর ছাড়লুম, সাধু হলুম, আবার সেই কলেজ ফিরে এলো? এ যে নিতান্ত সেই কলেজে পড়ার ব্যাপার হ'য়ে উঠল!" এই সময়ে কালীবেদান্তী একমনে পড়াশুনা করিয়াছিলেন। শশী মহারাজ, তুলসী মহারাজ প্রভৃতি সকলেই যথাসাধ্য বিদ্যাচর্চ্চা ও তপস্যা করিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবুর প্রতিবাদ করিবার প্রথা

যদি কেহ কখন কখন কথা কহিতে কহিতে গিরিশ বাবুর মতের বিরুদ্ধে কথা কহিতেন, তাহা হইলে গিরিশ বাবু তাহার সম্মান রাখিয়া কহিতেন, "তা বটেও বটেও, তা না বটেও, না বটেও"; অর্থাৎ তুমি যাহা বলিতেছ সে কথা বটে, তা ছাড়া তার উপরেও বলিবার কথা অনেক আছে। শরৎ মহারাজও ঐ ভাবের কথা শিখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,— "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are ever dreamt of in your philosophy"

সান্যাল মহাশয়ের সহিত সখ্যতা

পাহাড়ে যাওয়া অবধি শরৎ মহারাজ সান্যাল মহাশয়ের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। সেই অবধি শরৎ মহারাজের সহিত সান্যাল মহাশয়ের সখ্যতা জন্মে। দু'জনের মনে বড় মিল ছিল এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত দু'জনের বড় হৃদ্যতা ছিল। কথাবার্ত্তা বিশেষ হ'ক বা না হ'ক, একসঙ্গে বসিয়া থাকিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের সমস্ত জীবন একত্র অতিবাহিত হইয়াছিল।

এক বুড়োকে ভূতের ভয় দেখান

আলমবাজারের মঠ যে বাড়ীতে হইয়াছিল সেই বাড়ীতে একটা বা দুইটা আত্মহত্যা হইয়াছিল। এইজন্য বাড়ীটাকে ভূতের বাড়ী বলিত। একদিন গরমীকালে আমি আলম-বাজার মঠে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গরম বড় বেশী ছিল, সেইজন্য পরিধেয় ধুতিখানা ঘামে ভিজিয়া যাওয়ায় পশ্চিম দিকের জানালাতে ধুতিখানা একটা গেঁট বাঁধিয়া শুকাইতে দিই; কাপড়খানা তুলিতে মনে নাই। রাত্রে হাওয়াতে কাপড়খানা এদিক ওদিক করিতেছে। পাড়ায় এক রব উঠিল যে, প্রকাণ্ড এক ভূত এ ছাত ও ছাতে পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার পরের দিন সকাল বেলা খুব গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ হইল। সন্ধ্যার পর এক বৃদ্ধ অতি হিতৈষী হইয়া

বলিল যে, পূর্ব্ব রাত্রে সে এক ভূতকে ছাতে এক পা ও নারিকেল গাছে এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। হিতৈষী বৃদ্ধের মাথায় যত আজগুবি ছিল সব আওড়াইল। শরৎ মহারাজ, গুপ্ত মহারাজ, আমি আর যে যে ছিল, সকলে বেশ চুপ করিয়া শুনিলাম। বৃদ্ধ এই সমস্ত বলিতে বলিতে এত অভিভূত হইয়াছিল যে, সিঁড়িটুকু পার হইয়া রাস্তায় যায় এ সাহস আর তাহার নাই। সে গুপ্ত মহারাজকে অনেক কাকুতি করিয়া বলিল যাহাতে লণ্ঠনটা দেখিয়ে তাহাকে রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসে। লোকটার সহিত রগড় করিবার জন্য গুপ্ত মহারাজ লণ্ঠন লইয়া সিঁড়ি দিয়া খানিক নামিলেন, আগে বৃদ্ধ, পিছনে গুপ্ত মহারাজ। সিঁড়ির বেঁক-টুকু পার হইয়া গুপ্ত মহারাজ লণ্ঠন নিবাইয়া দিলেন আর দৌড়িয়া উপরে আসিয়া কপাটের শিকল বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কোন শব্দ না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হিতৈষী বৃদ্ধটি, "বাপ রে মা রে! ভূতে ধল্লে রে!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সদর দরজাটুকু পার হইয়া রাস্তায় নামিয়া এক দৌড় দিয়া আপনার বাটীর দিকে ছুটিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল "ওরে ভূতে ধল্লে রে।" বুড়োর ভূতের ভয় দেখে আমরা ত হেঁসে লুটোপুটি। তারপর রাত্রে যখন সকলে শুয়েছে, গরমীকাল, কাহারও ঘুম হইতেছে না, শরৎ মহারাজ সকলকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। সে দিন তাঁর

খেয়ালটা অন্য রকম হ'য়েছিল, কেবল লোককে ভূতের ভয় দেখাতে লাগলেন। এইত কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রে পরস্পরে ভূতের ভয় দেখান আর হাসিতামাসা চলিতে লাগিল। যদিও শরৎ মহারাজ স্বাভাবিক ধীর, তবুও মাঝে মাঝে হাসি-তামাসা করিতেন।

বড় ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদা

যদিও শরৎ মহারাজ পড়াশুনা করিতেন ও মাঝে মাঝে হাসিতামাসা করিতেন, কিন্তু তখন তিনি জীবনের কি লক্ষ্য কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই বা জানিতেন না। এইজন্য অনেক সময় বড় ঘরটিতে শুইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া থাকিতেন এবং চোখের দুইধার দিয়া জলের ধারা পড়িত। এইরূপ ভাব অনেক সময় হইত। তিনি বলিতেন, "জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিই বা হ'লো! এর ওর বাড়ীতে ভিক্ষা ক'রে খাওয়া আর মাটিতে পড়ে থাকা, এই ত হ'লো। কই কিছু ত দেখতে পাচ্ছি না।" এই রকম বিষণ্ণভাব প্রায়ই হইত। জগৎটা যেন নিভে গেছে, আর যেন সাহস উদ্যম কিছুই নেই। এইরূপে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতেন এবং এক বা দুই দিন কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, নিজের মনে গুম হইয়া থাকিতেন।

শরৎ মহারাজের এইরূপ বিষণ্ণভাব দেখিয়া সকলেরই মনে বড় কষ্ট হইত। হিমালয় পাহাড়ে ভ্রমণ করিবার

সময় নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য Bunyan's Pilgrim's Progress হইতে বলিতেন—Slough of despondency, Castle of doubt, Giant of despair, Key of faith. শরৎ মহারাজও মাঝে মাঝে ঐ সব কথা বলিতেন। যথার্থই Slough of despondency কি ভয়ঙ্কর জিনিষ! Castle of doubt কি ভীষণ! Giant of despair কি শক্তিমান! তিনি মাঝে মাঝে গাহিতেন,

সংশয় তিমির মাঝে
গতি না যে দেখি হে।

এইরূপ নিরাশ ভাব দুই বা আড়াই বৎসর ছিল, তারপর সেটা কাটিয়া যায়।

জয়পুর থেকে স্বামিজীর পত্র আসা

মীরাট হইতে ছাড়াছাড়ির পর স্বামিজীর আর কোন খবর জানা ছিল না। কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন, কেহই জানিত না। গরমীকালে একখানা চিঠি আসিল। ঠিকানা নাই কিন্তু বলা আছে ওমুক বাটীতে জিনিষ পাঠাবে। বরাহনগরে হাতকাটা হাবুর বাটীতে একটা ওষুধ পাওয়া যাইত, চিঠিতে লেখা আছে ঐ ওষুধ পাঠাবে কিন্তু কাহারও নাম স্বাক্ষর ছিল না। চিঠিখানি নরেন্দ্রনাথের বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু নিশ্চিত হইবার জন্য আমি যাইলে

আমাকে দেখান হইল। আমি বলিলাম, চিঠি নরেন্দ্রনাথের তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক দিন পরে এই একটু খবর পাওয়া গিয়াছিল, তারপর আর কোন খবর আসিল না।

খেতড়ীর রাজার কথা

কয়েক বৎসর নরেন্দ্রনাথের কোন খবর ছিল না। কেবল মাত্র জয়পুর হইতে একখানা চিঠি আসিয়াছিল, তাহাতে নাম লেখা ছিল না। পরে জয়পুরের অধীনস্থ খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহ চিঠি লিখিতে স্বরু করিলেন। তিনি নিজে স্বামিজীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং স্বামিজী কিছুদিন তাহার কাছে ছিলেন, জানাইলেন। সেই সময় হইতে নূতন আলাপীরা শিষ্যের স্থানীয় হইয়া গুরুর মত নরেন্দ্র-নাথের সহিত আলাপ করিত। এইজন্য সকলেই স্বামিজী মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিত। এই সময় মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মাইসোর প্রভতি দক্ষিণের স্থান হইতে চিঠি আসিতে লাগিল এবং একটা মহৎকার্য্যের যেন সূচনা হইতে লাগিল। চিঠি বন্ধ হইবার পূর্ব্বে যে কয়েকখানি চিঠি আসিয়াছিল, তাহাতে মনের ভাব অতি বিষণ্ণ ইহা প্রকাশ ছিল, এবং সর্ব্ব বিষয়ে একটা বিদ্বেষ ও বিরক্তির ভাব ছিল। কিন্তু এখনকার চিঠিতে সে সব ভাব কাটিয়া গিয়াছে; বেশ শান্ত, ধীর, উদার-চিত্ত লোক। চিঠিতে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ ছিল, "ভগবান ত পাইলাম না, অনেক চেষ্টা করিলাম, তাতেও কিছু

বুঝিতে পারিলাম না, তবে বুকের ভালবাসাটা বেড়ে গেছে, সকলের উপর একটা ভালবাসা এসেছে।"

এই সকল চিঠি সাণ্ডেল মশাই, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও আমি এই চারিজনে খুলিতাম ও পড়িতাম। কারণ স্বামিজীর নিষেধ ছিল যে, তাঁহার গতিবিধি লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না বা গোলমাল করিবে না। তিনি একটা মহৎ কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে বিষয়ে বাজারে যেন কেউ গোল না করে। স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহ তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য এবং কোন সঙ্কোচ না করিয়া রাজা সাহেবের সহিত চিঠি লিখিবে। তদবধি, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সাণ্ডেল মশাই ও আমি এই চারিজনে পরামর্শ করিয়া চিঠি লিখিতাম। শরৎ মহারাজ ও সাণ্ডেল মশাই এই সময়ে খুব উদার ভাব দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে, নরেন্দ্রনাথের অনুগত ইহা প্রত্যেক কাজে এবং কথায় দেখাইয়াছিলেন। স্বামিজীর আদেশ শরৎ মহারাজ এবং সাণ্ডেল মহাশয়ের কাছে বেদ-বাক্য বলিয়া বোধ হইত; অবিচলিত চিত্তে কোন দ্বিধা না করিয়া সেই কার্য্যে প্রস্তুত হইতেন। যাহাকে চলিত কথায় বলে, 'কায়া ও ছায়া', ঠিক তদনুরূপ হইয়াছিল। স্বামিজীর তখনকার চিঠি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং পরে যে, তিনি একজন বড় বক্তা হইবেন, চিঠিতে সেই সব লক্ষণ ছিল। সেই সব চিঠি এখন আছে কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

এই সময়ে শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও সাণ্ডেল মশাই স্বামিজীর বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন এবং স্বামিজী শরৎ মহারাজের উপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর করিতেন; নিতান্ত ভালবাসিতেন এইজন্য মাঝে মাঝে ধমক দিতেন ও গাল পাড়িতেন। সামান্য তস্‌ফির বা অপরাধ হইলে একেবারে কঠোর গালমন্দ করিতেন। স্বামিজী শরৎ মহারাজকে হোঁৎকা বলিয়া ডাকিতেন অর্থাৎ অল্পবুদ্ধির লোক ও অবিবেচক, কিন্তু এরূপ বকুনি ও গালমন্দ দিয়া তাহাকে কাজের লোক করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক, সর্ব্ব বিষয়ে কাজের ভার পাওয়ায় শরৎ মহারাজের বিষণ্ণ ভাব কাটিয়া গেল, মনটা একটু সজাগ হইয়া উঠিল, এবং কিছু করিতে হইবে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি করিতে হইবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, কিন্তু প্রাণে একটা আশা ছিল যে, একটা বড় কাজ করিতে হইবে। সর্ব্বদা খেতড়ীর মহারাজা ও স্বামিজীর অপরাপর বন্ধু এবং শিষ্যদের চিঠি লেখা ইত্যাদি কাজ শরৎ মহারাজ করিতে লাগিলেন। এই সময় খেতড়ীর মহারাজা, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও সাণ্ডেল মশাইয়ের মারফত স্বামিজীর মাতাঠাকুরাণীকে মাসে একশত টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এ সকল কথা যেন অপরে জানিতে না পারে। যাহা হউক, সাণ্ডেল মশাই এই সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে নিজের প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন এবং সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার

পাত্র হইয়াছিলেন। সাণ্ডেল মশাইয়ের নাম হইতেছে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ সান্যাল।

Principle and Person. মত ও ব্যক্তি

বলরাম বাবুর বাটীতে শরৎ মহারাজের সহিত আমার কথা হইতে লাগিল। কথাটা এই যে, মত বড় না Person বা ব্যক্তি বড়। আমি বলিলাম যে, ব্যক্তিকে না বুঝিলে তাহার ভাব বুঝা যায় না। এই দেখ যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য এদের বুঝিতে পারি, আর ইহাদের ভিতর দিয়া ইহাদের মত বুঝিতে পারি। মানুষ নিজের অবস্থায় অপরকে বুঝিতে পারে এবং অপর ব্যক্তি যে, নিজের চেয়ে বড় এইটুকু বুঝিয়া প্রথম চলিতে সুরু করে এবং যতই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হয় এবং সান্নিধ্যলাভ করে ততই দেখে অপর ব্যক্তি কত বড়। আমাদের যে, ভগবান বা অপর কোন উচ্চ ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাহা আমরা কোন উচ্চ ব্যক্তি হইতে লাভ করিয়াছি। শুধু নিরপেক্ষ ভাব বা Principle কিছুই বুঝিতে পারি না যতক্ষণ না ব্যক্তিকে বুঝিতে পারি। আর দেখ, তোমার Principle বা ভাব সাধারণ লোকে কিছুই বুঝে না। ও জিনিষটা এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়; লোকের ওতে কোন আস্থা নেই। একটা Concrete Person চাই। একটা জ্বলন্ত জীবন্ত লোক চাই, যে তার আদেশ লোকে মাথা পেতে মেনে

নেবে। এতে সাধারণ লোক বুঝবে, অর্থাৎ আগে Person (ব্যক্তি) তারপর Principle (ভাব)।

শরৎ মহারাজ বলিলেন, "ওহে, তুমি ওটা আজকালকার কথা বলছ।

বৈদিক সময় এত ঋষি হ'য়েছিল তাদের ভাবগুলো লেখা রয়েছে, কিন্তু লোকগুলো যে, কারা ছিল সে বিষয় কিছুই লেখা নেই। অল্প কথায় দেখ, কালিদাস প্রভৃতি যে কাব্য লিখে গেছে তার কাব্যগুলোই জানি, কিন্তু কিরূপ লোক ছিল সে তার কিছুই জানি না। আমাদের ভারতবর্ষে বহু কাল ধ'রে একটা প্রথা চলে আসছে যে, Principle বা ভাবগুলো প্রকাশ করিবে কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব কখন প্রকাশ করিবে না। এমন কি দেখ, ব'য়েতে নিজের নাম পর্য্যন্ত দেয় নি, সব জায়গায় ব'লে যাচ্ছে যে, ব্যাসের লিখিত কিন্তু দ্বৈপায়নের অনেক পরে এই সব বই লেখা হ'য়েছে।

এই Principle-এর উপর বইগুলো লেখা হয়েছে, ব্যক্তি সব লোপ পেয়েছে। কিন্তু বুদ্ধ এমন একটা লোক হয়েছিল যে, সে পুরানো নিয়ম সব উল্টে ফেললে। বুদ্ধ বরাবর বলছে যে, এই Principle বা ভাবই মহা সত্য, এটাকেই তোমরা মানবে। কিন্তু তার Personal grandeur বা ব্যক্তিগত প্রতিভা এত বেশী ছিল যে, তার শিষ্যেরা ভাব ও ব্যক্তি মিশিয়ে ফেললে। এর পরবর্ত্তী সময়েতে ব্যক্তি বড় হ'লো, ভাব ছোট হ'য়ে গেল। এই স্থান থেকে জগতে একটা নূতন

জিনিষ উঠিল যে, ব্যক্তি বড়—ভাব ছোট। ফলে হ'লো কি, Principle বা ভাব সব উড়ে গেল, দাঁড়াল কি না বুদ্ধ অমুক দিন অমুক ব'লেছিল আর অমুক নিষেধ করেছিল। এই অবলম্বন ক'রে নানারূপ মতামত আর ব্যাখ্যা উঠতে লাগল ও দল পাকাতে লাগল, কিন্তু আসল Principle গোল্লায় গেল। এই বুদ্ধের সময় থেকে যতগুলো ধর্ম্ম সম্প্রদায় উঠেছে, সকলেই Person নিয়ে টানাটানি করেছে। কিন্তু বৈদিক যুগে Principle বড় ছিল, Person নয়।

দেখ, আমি একথা বলছি না যে, ব্যক্তিকে একেবারে মানবে না। ব্যক্তিকে মানতে হবে, কারণ শ্রদ্ধা ভক্তির একটা বিশেষ উপাদান; কিন্তু Principleকে Person-এর চেয়ে বড় ব'লে মানতে হবে, এই হচ্ছে ধর্ম্মের মূল। আর দেখবে, যেখানে এর ওলোট পালোট হবে সেখানেই গণ্ডগোল বাধবে আর দল পাকাবে, আর সেই ধর্ম্ম-মতটা অতি শীঘ্র ধ্বংস পেয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সাধারণ লোক Personকেই ভাল বোঝে; আর Principleটাকে খাতির করে সেই Person-এর ব'লেই।" যাহা হোক, সেদিন এ সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল।

স্বামিজীর আমেরিকায় গমন

পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃঃ স্বামিজীর আমেরিকা যাইবার কথা

হইতেছিল। স্বামিজী বোম্বাই হইতে জাহাজে করিয়া জাপান দিয়া ভ্যাঙ্কোবর যাইলেন। আমরা এ বিষয়ে কোন খবর পাই নাই, কিন্তু খেতড়ীর রাজা অজিত সিংহের সহিত সর্ব্বদাই চিঠির আদান-প্রদান ছিল। খেতড়ীর রাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটরি মুন্সী জগমোহন লাল এ বিষয়ে পরে আমাদের জানাইলেন। আমি ঐ চিঠিখানি যোগেন মহারাজ এবং সাণ্ডেল মহাশয়কে দেখাই। মুন্সীজী জানাইয়াছিলেন যে, এসব কথা যেন বাজারে রাষ্ট্র করা না হয়। এবং আমাদের মনেও একটা বিশেষ আশঙ্কা ছিল যে, স্বামিজী চিকাগোর Parliament of religion-এ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কিনা। এই জন্য শরৎ মহারাজ প্রভৃতি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন, কখন কি খবর আসে। ক্রমে ক্রমে কথাটা আপনা-আপনির ভিতর সকলে জানিলে আর গোপন রাখা উচিত বিবেচনা করা হইল না। কিন্তু হাটে বাজারে কিছুই বলা হইল না। একজন বলিল, Speech governs English Politics অর্থাৎ বক্তৃতাই হ'চ্ছে ইংরাজ রাজনীতির প্রধান উপাদান। কিন্তু স্বামিজী বক্তৃতাও করিতে পারেন না, এবং ইংরাজী ভাষাও ভালরূপে জানেন না, এস্থলে কি হইবে? এই সময় সকলের মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। আশা ও নিরাশা দু'টায় দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। এবং সকলেই একবার উৎসাহিত এবং একবার বিষণ্ণ হইতেছিল।

অবশেষে কালী পূজার কয়েকদিন পর Statesman

কাগজে প্রথম খবর বেরুল। স্বামী বিবেকানন্দ নাম শুনিয়া সাধারণ লোক স্থির করিল যে, কোন মান্দ্রাজী লোক হইবে। কারণ তখন বউবাজারে অনেক মান্দ্রাজী অর্শের ডাক্তার ছিল। তাহাদের নামের পূর্ব্বে স্বামী এবং পরে ঐরূপ একটা আনন্দ থাকায় সাধারণ লোক স্বামিজীকে মান্দ্রাজী ঠিক করিল।

মাষ্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা (শ্রীম), যে খবরের কাগজখানিতে স্বামিজীর বিষয় বাহির হইয়াছিল, সেখানি লইয়া ৮নং রামতনু বসুর গলির বাটীতে আমার কাছে আসিলেন। আমি তখন মাষ্টার মশাইকে সমস্ত কথা বলিলাম। আমরা বেলা আন্দাজ দশটার সময় বাগবাজারে যাইয়া শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সাণ্ডেল মশাই প্রভৃতি সকলকে বলিলাম এবং সকলেই বেশ আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে প্রত্যহই খবরের কাগজে স্বামিজীর কথা বাহির হইতে লাগিল এবং সহরে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, একজন বাঙ্গালী যুবক আমেরিকা যাইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। সহরের লোকেরা বেশ চনমনে হইয়া উঠিল। তাহার পর Marwin Mary Snell-এর লিখিত পত্র-খানি বাহির হইল। এবং ক্রমে স্বামিজীর প্রদত্ত অভিবাদনটিও বাহির হইল। এ সকল খবর আমরা বাহির হইতে পাইলাম কিন্তু এখনও স্বামিজীর নিজের হাতে কোন চিঠি আসিল না।

স্বামিজীর কার্য্য আমেরিকায় সফল হইয়াছে এবং হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া খৃষ্টান ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। তাহাতে সহরের লোকের মত দুই ভাগে বিভক্ত হইল। কেহ কেহ ব্রাহ্ম পক্ষ অবলম্বন করিল কেহ বা স্বামিজীর পক্ষ লইল; এই ত গেল বাহিরের বিরোধ-ভাব। অল্প দিনের মধ্যে Parliament-এ প্রদত্ত স্বামিজীর বক্তৃতা কলিকাতায় আসিল। তাঁহাতে বেদান্তের ভাব আছে এবং অহং বা আমি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ ছিল না। বাবুরাম মহারাজ এইজন্য বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি একেবারে ভূতগ্রস্ত পাগলের মত হইয়া উঠিলেন এবং সর্ব্বত্র স্বামিজীর নিন্দা গালাগালি ও কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। নিজের মতের অনুযায়ী একটি দল গঠন করিয়া আলমবাজারের মঠ হইতে কলিকাতার নানা স্থানে তাঁহার দলের লোকের মধ্যে স্বামিজীর নিন্দা রটাইতে লাগিলেন। যাহাকে বলে Fanatic পাগল, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল গালমন্দ রটাইতে লাগিলেন। একদিন বেলা ন'টার সময় শরৎ মহারাজ ও আমি গিরিশ বাবুর ঘরে যাইলাম। গিরিশ বাবু খুব রাগিয়া আছেন। গিরিশ বাবু বসিয়া একটি থেলো হুঁকাতে নল লাগাইয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমাদের দেখিবামাত্র গিরিশ বাবু সরোষে বলিলেন, "শরৎ, বাবুরামকে আসতে

ব'লো। বাবুরাম পাগল হ'লো নাকি যে, সে নরেনের এমন নিন্দা করে বেড়াচ্ছে? নরেন তার গুরুর জন্য দেশ বিদেশে তাঁর কাজ কচ্ছে আর বাবুরাম এখানে তারেই গাল পাড়ছে।" এই বলিয়া গিরিশ বাবু হুঁকার নল সরাইয়া রাখিয়া বাবুরাম মহারাজকে যা মুখে আসিল তাহাই বলিলেন।

শরৎ মহারাজ, কালীবেদান্তী ও সাণ্ডেল মহাশয় মহা বিপদে পড়িলেন। বাহিরে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মরা ভীষণ শত্রুতা করিতেছে, আর ঘরে বাবুরাম মহারাজ শত্রুতা আরম্ভ করিল। বাহিরের শত্রু হইতে ঘরের শত্রুকেই বেশী ভয়। শরৎ মহারাজ, কালীবেদান্তী ও সাণ্ডেল মহাশয় মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

একদিন বলরাম বাবুর বড় ঘরটিতে বারান্দার দিকে পশ্চিমের দ্বিতীয় দরজার কাছে একটি হারিকেন লণ্ঠন রাখিয়া সারদা মহারাজ স্বামিজীর আমেরিকার লেকচার পড়িতে লাগিলেন। আমি সারদা মহারাজের পিছনে বসিলাম। শরৎ মহারাজ সারদা মহারাজের ডান দিকে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন আর সাণ্ডেল মশাই আলোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সারদা মহারাজ খানিকটা পড়িলেন, আমরা শুনিতেছি, তাহাতে "I" বা অহং লেখা রহিয়াছে, অমনি বাবুরাম মহারাজের দলের একজন লোক পা দুটো ফাঁক ক'রে কোমর বেঁকিয়ে পিঠ কোঙা ক'রে বুকে আঙ্গুল দিয়া টোকা মারিতে মারিতে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল

এবং বিকৃত স্বরে "I—I" বলিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল—"অহঙ্কারে মটমট কচ্ছে, কেবল নিজের নাম জাহির করাই উদ্দেশ্য।" এইরূপ নানা কটূক্তি করিতে লাগিল। শরৎ মহারাজ এই সব দেখিয়া একেবারে বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন, চোখ জলে ভ'রে গেল। তারপর কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ হে, সকলেই নরেনকে গালাগালি দিচ্ছে, আর প্রতাপ মজুমদারের কথা মেনে নিচ্ছে।" আমি বলিলাম—"Man will more worship the rising sun and not the setting sun. লোকে উদীয়মান সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে, অস্তগামী সূর্য্যের কেহই পূজা করে না।"

কথাটা শরৎ মহারাজের প্রাণে খুব লাগিল। তারপর তিনি দৃঢ়ভাবে সোজা হইয়া বসিলেন এবং কালীবেদান্তীর সহিত একমত হইয়া আমার সহিত বকুনি ও ঝগড়া সুরু করিলেন। অবশ্য শরৎ মহারাজ ও কালীবেদান্তী আমার সহিত যে ঝগড়া করিতে লাগিলেন তাহার কোন মাথা মুণ্ড ছিল না; এমনি কথা কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। উহাদের বুকে যে একটা যন্ত্রণা হইতেছিল সেইটা কোন রকমে প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু এই গালাগালি শরৎ মহারাজ এবং কালীবেদান্তীর জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ইহার পূর্ব্বে উভয়ে সাধনার ভাবে ছিলেন, সব সময়ে হতাশ ও বিষণ্ণ হইয়া থাকিতেন। নিজেদের মধ্যে যে, কোন শক্তি আছে তাহা

বুঝিতেন না। সর্ব্বদাই নিস্তেজ ও নির্জ্জীব হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু এই গালাগালি খাইয়া তাঁহাদের সাধারণ জীবন তিরোহিত হইল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মের জীবন আসিল।

শরৎ মহারাজ, সাণ্ডেল মশাই ও কালীবেদান্তী ইহার পরদিন কলিকাতার অনেক যুবকদের ডাকাইয়া একটি কমিটির মত বসাইলেন। গিরিশ বাবু ইহাতে সহানুভূতি দেখাইলেন। গিরিশ বাবু কি কি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেন এবং কালীবেদান্তী যুবকদিগকে লইয়া সহরের নানাস্থানে কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন। বাবুরাম মহারাজের উৎপাতে আর কেহই ভ্রূক্ষেপ করিল না। কাজেই বাবুরাম মহারাজ আপনা-আপনি ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। নানা প্রকার সংবাদপত্রে স্বামিজীর বিষয় লেখান হইতে লাগিল। কালীবেদান্তী মিনার্ভা থিয়েটারে, অবশেষে টাউনহলে একটি বড় মিটিং করাইলেন। কালীবেদান্তী এই মহৎ কার্য্য লইয়া পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাত এগারটা বারটা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন, তারপর বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেন। সেই দিনকার ঐ গালাগালিটা শুভপ্রদ হইয়াছিল; কারণ সেই হইতেই এই দুইটি যুবক অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কি প্রভূত শক্তি ছিল। এবং পরবর্ত্তী কালে উভয়েই মহা কর্ম্মী বলিয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন।

ক্রমেই আমেরিকা হইতে স্বামিজীর নিজের লিখিত চিঠি আসিতে লাগিল। তাহাতে নানা প্রকার কর্ম্মপ্রণালী লিখিত থাকিত। বিশেষ একটি কথা ছিল, ইংরাজীতে, বাংলাতে, হিন্দীতে ও উর্দ্দুতে সংবাদপত্র বাহির করিবার কথা। সারদা মহারাজ বাংলা ও ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার ভার লইলেন, কারণ তিনি মাঝে মাঝে Indian Mirror-এ প্রবন্ধ লিখিতেন। শরৎ মহারাজ, সারদা মহারাজের কথা অনুযায়ী একখানি উর্দ্দু মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে ইহাদের কর্ম্ম জীবনের স্ফুরণ হইতে লাগিল। তখন আর জপ ধ্যান ও চুপ করিয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়া থাকা জীবনের প্রধান লক্ষ্য রহিল না, কিন্তু স্বামিজীর কর্ম্মভাবটা কয়েকজনের ভিতর খুব প্রবল হইয়া উঠিল।

বাক্সে ক'রে ডাল এবং আচার পাঠান

স্বামিজী কয়েক বৎসর আমেরিকায় আছেন। বিদেশী রান্না খাইয়া একেবারে অরুচি হইয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কিছু ডাল, বড়ি, আমতেল ও পাঁচ-ফোড়ন পাঠাইয়া দিতে। এই সকল জিনিষ তাঁহার অত্যন্ত খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। শরৎ মহারাজ, কালীবেদান্তী ও সাণ্ডেল মশাই এই সকল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া বাক্সবন্দি করিয়া আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। এই জিনিষগুলি স্বামিজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শরৎ মহারাজ ও আমি যখন লণ্ডনে

ছিলাম তখন চাটনি, আচার ও পাঁচ-ফোড়নের কিছু বাকী ছিল। পাঁচ-ফোড়ন দিয়া স্বামিজী মধ্যে মধ্যে আলু চচ্চড়ি রান্না করিতেন। Goodwin আমতেল মুখে দিয়া নানা রকম মুখভঙ্গী করিত ও গাল পাড়িত; কারণ হিঙ্গের গন্ধ সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু স্বামিজীর প্রিয় জিনিষ বলিয়া Goodwin সে জিনিষগুলি ফেলিয়া দিত না বরং সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া দিত

শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর ইংলণ্ড যাত্রা

স্বামিজী একখানা 'বাচস্পত্যম্ অভিধানম্' চাহিয়া পাঠান। আমি যখন লণ্ডনে যাই তখন কালীবেদান্তী ও সাণ্ডেল মশাই একটি বাক্সে করিয়া সেই বইগুলি আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। আমি সেইগুলি লইয়া গিয়া Sturdy কে দিয়াছিলাম। তাহার পরের খবর আর কিছুই জানি না। স্বামিজী কর্ম্ম করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার সহকারীরূপে একজনকে চাহিয়া পাঠান এবং শশী মহারাজকে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময়ে শশী মহারাজের গায়ে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং Dr. Salzar-এর নিষেধ অনুযায়ী শশী মহারাজের যাওয়া হইল না। শরৎ মহারাজের যাওয়া ঠিক হইল। শরৎ মহারাজ কয়েকটা বনাতের ইজের ও জোমা করাইয়া লইলেন এবং ইং ১৮৯৬ সালে মার্চ্চ মাসের শেষে বা এপ্রিল মাসের প্রথমে B. I. S. N. Co.র জাহাজে

করিয়া লণ্ডনে চলিয়া যান। সেই স্থানেই বহু বর্ষ পরে স্বামিজীর সহিত পুনঃ শরৎ মহারাজ মিলিত হন।

সেবা-সিদ্ধি

(সাণ্ডেল মশাই কথিত) কাশীপুর উদ্যানবাটীতে পর্য্যায়-ক্রমে প্রাণপাত করিয়া যে সকল যুবক সেবা করিতে লাগিলেন, শরৎ মহারাজ তাঁহাদের অন্যতম। সেবা দ্বিবিধ—আপ্তবৎ এবং পরা। আপন শরীর সুস্থ রাখিয়া মনের যাহাতে তৃপ্তি হয়, এই ভাবে সেবা করাকে আপ্তবৎ সেবা কহে। আর নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সেব্য বা আরাধ্যের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তাঁহার মনোভাব ধ্যান করিয়া যে সেবা তাহাকে পরা সেবা বলে। শরৎচন্দ্রের সেবা ছিল পরা সেবা।

তিনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াও আর একজন গুরু-ভ্রাতাকে বিশ্রাম দান করিবার বাসনায় আনন্দ সহকারে তাহার কার্য্য করিতেন। উদার স্বভাব, সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা এবং ভ্রাতৃবৎসলতা দেখিয়া ঠাকুর শরৎচন্দ্রের উপর প্রীত হন। অভীষ্টদেবের প্রিয়কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রীতি সম্পাদনই পরম সাধন; শরৎচন্দ্র এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্ম দর্শন, দেব দেবীর মূর্ত্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হওয়ায় বা ভাবপ্রবণতায় তাঁহার বাসনা ছিল না। কেবল মাত্র এই অভিলাষ ছিল যে, সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া

কৃতার্থ হইবেন। ঠাকুর ইহা শ্রবণে প্রীতমনে আশীর্ব্বাদ করেন যে, কালে এই বাসনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমন

ইংরাজী ১৮৯৬ সালে পূজনীয় সারদানন্দ স্বামী ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাহার সপ্তাহকাল পরে বর্ত্তমান লেখক পড়াশুনা করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যান। তিনি স্বামিজীর জন্য 'বাচস্পত্যম্ অভিধানম্' গ্রন্থ লইয়া যান। সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক স্বামিজীর সহিত লণ্ডনে মিলিত হন। তাহার পর তাঁহারা স্বামিজীর সহিত পিংকিনিস গ্রীন (Pinkineys Green) নামক ইংলণ্ডের একটি গ্রামে গিয়া মিস মূলারের কুটীরে অবস্থান করেন এবং তথায় অল্প কয়েক দিন থাকিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডনে যাহাতে স্বামিজীর ক্লাস ও লেকচার ভালভাবে চলিতে পারে মিঃ স্টার্ডি প্রমুখ সকলে তাহার বন্দোবস্ত করেন।

এই সময়ে মিঃ স্টার্ডি লণ্ডনস্থ সাউথ-বেল্-গ্রেভিয়াতে ৫৭নং সেণ্টজর্জ ষ্ট্রীটের বাড়ীটি ভাড়া লন এবং স্বামিজী সকলকে (গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী, বর্ত্তমান লেখক, মিস মূলার ও মিঃ স্টার্ডি প্রভৃতি) লইয়া এই বাড়ীতে অবস্থান করেন। স্বামিজী বাড়ীতে ক্লাস করিতে থাকেন এবং লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি দেন। এই সময়কার কার্য্যাবলীর বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান লেখক প্রণীত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ"

১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ দুইটি হইতে এবং তৎপ্রণীত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" ৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হইতে এই স্থলে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠকগণ পূজনীয় সারদানন্দ স্বামী কিরূপ একনিষ্ঠ ভাবে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় স্বামিজীর কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

(সঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা ও প্রঃ ম্যাক্স মূলারকে তাহা দিয়া আসা

স্বামিজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ ত!" মিস মূলার পত্র লিখিয়া প্রঃ ম্যাক্স মূলারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, স্বামিজী এক নির্দ্ধারিত দিনে অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। সারদানন্দ স্বামী ব্যস্তসমস্ত হইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিলেন। মিস মূলারের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া সারদানন্দ স্বামী সেইটি পড়িলেন ও স্বামিজী শুনিয়া একটু আধটু বদলাইয়া দিলেন, কিন্তু লেখাটি পছন্দ করিলেন। তাহার পরদিন সেই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি লইয়া স্বামিজী, সারদানন্দ স্বামী ও মিস মূলার অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখিয়াছেন সেই লিখিত

জীবনীর ঘটনাবলীর অনেক অংশ সারদানন্দ স্বামীর রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে; এমন কি সেই ভাষাও স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে।

থিয়সফিষ্ট হল-এ লেকচার দেওয়ার কথা

রিজেণ্ট পার্কের কাছে, সম্ভবতঃ পার্ক অ্যাভিনিউ নামক পল্লীতে একটি প্রধান স্থান আছে। বর্ত্তমান লেখক একবার সেই বাড়ীতে গিয়াছিলেন। স্বামিজীকে 'নিরামিষ ভোজন' (On Vegetarianism) বিষয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য তাহারা অনুরোধ করে। স্বামিজী থিয়সফিস্ট হল-এ লেকচার দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। স্বামিজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "শরৎ, তুমি গিয়ে ওখানে লেকচার দাও গিয়ে।" সারদানন্দ স্বামী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, হাঁ না বলিতে পারিলেন না। এদিকে ত মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। উপরকার ঘরটিতে গিয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন, "আরে ভাই, নরেন ত বড় ফ্যাসাদে ফেললে। এই আবার কি বিপত্তি! সামনাসামনি গিয়ে লেকচার দিতে হবে। যদি ভুল করি, বলা ত অভ্যাস নেই! আর নরেন যা রাগী হ'য়েছে, ভুল করলে হয় ত মেরেই বসবে। শেষ কালে কি বুড়ো বয়সে মারটা খাব? আগে বলেছিল আমেরিকাতে গিয়ে লেকচার দিতে হবে; সে নয় ওপারে গিয়ে যা হয় হোত। সেখানে ত নরেন থাকতো না। এই

সামনাসামনি ধরা পড়লে বিপদ। না বাপু, নরেন রাগ করবে! একবার তাঁকে স্মরণ ক'রে যা পারি কিছু বলবো, গাল খেতে হয়, না হয় খাব।" সারদানন্দ স্বামী ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। শক্তিমান হইলেও অনভ্যস্ত বশতঃ বলিবার সাহস ছিল না। সেরূপ আত্মপ্রত্যয় হয় নাই, সেইজন্য তিনি এত দ্বিধা করিয়াছিলেন। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলে সারদানন্দ স্বামী অতি নম্রভাবে গাঁইগুঁই করিতেন। অর্থাৎ ভয় পেয়েছেন সেইটা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিতেন। স্বামিজী কখনও উত্তেজিত ভাবে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন, কখনও বা হাস্য করিতে করিতে গালি পাড়িতেন। উভয় কার্য্য নিতান্ত ভালবাসার পরিচয়। কারণ স্বামী সারদানন্দ স্বামিজীর ছায়ার ন্যায় থাকিতেন।

যাহা হউক, একদিন বিকালবেলা স্বামিজী থিয়সফিস্ট হল-এ গিয়া লেকচার দিয়া আসিলেন। নিরামিষ ভোজনের প্রশংসা করিলেন এবং হাতী ও সিংহের আহার অনুযায়ী শক্তি বিকাশের তারতম্যের বিষয় বলিতে লাগিলেন। নিরামিষ ভোজনের অনেক সুখ্যাতি করিলেন। কিন্তু বক্তৃতা সমাপন কালে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন, আদর্শ উচ্চ বটে কিন্তু তিনি সব সময় নিরামিষ খান না; মাঝে মাঝে মাছ মাংস খান। তিনি যদিও আদর্শ অনুযায়ী সব সময় চলিতে পারেন না, তবে আদর্শকে নীচু করিবার আবশ্যক নাই। তিনি ইংরাজ জাতি ও হিন্দু জাতির আহার অনুযায়ী ভাবের পার্থক্য,

সামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য দেখাইয়া দিলেন। যাহা হউক, পাঁচটা ভাবের সংযোগ, মিলন ও পার্থক্য দেখাইয়া তিনি লেকচারটি বেশ হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিলেন।

লেকচার হইতে ফিরিয়া আসিয়া সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "যা, তোকে আর ভয় ক'রতে হবে না। আরে করলুম কি—এই গোটাকতক কথা বেশ সাজিয়ে বলে দিলুম। তখন দাঁড়িয়ে যা হ'ল মুখে তাই বলে দিলুম। এদের কিছু গ্রাহ্য করবার মত নেই! নেড়েচেড়ে মিশে বেশ দেখিয়ে দিলুম, কাদের ভেতর সেই সব উঁচু ভাব আছে! এরা ছুনিয়াদারিটা খুব বোঝে। এদের ভয় খাচ্ছিস কেন রে! আরে পোকামাকড়ের মত পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবি। আহার হ'চ্ছে হিন্দুদের ভেতর। এদের সে সব 'ইণ্ডিয়া' বুঝতে অনেক দেরী!" এই ভাবে তিনি প্রফুল্ল হইয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

স্বামিজী অন্য ঘরে চলিয়া যাইলে সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "যা হোক বাবা, ঘাম দিয়ে ত জ্বর ছাড়লো! এখন ত একপালা কাটলো, আজ ত বকুনি থেকে বাঁচলুম। আবার কি জানি কখন কোথায় লেকচার দিতে বলবে, সুমুখে থাকলে বিপদ। এখন ত আমেরিকাতে গিয়ে পালাই! সেখানে হয় হবে, না হয়, অমনি জাপান দিয়ে চম্পট।" এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সারদানন্দ স্বামীর আমেরিকা গমন

আমেরিকা প্রদেশে একজন কর্ম্মীর আবশ্যক হাওয়ায় স্বামিজী সারদানন্দ স্বামীকে তথায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। স্বামিজীর লেকচারে বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে সারদানন্দের যাইতে ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ বহু বৎসর পর সাক্ষাৎ হওয়ায় পরম প্রীতির সহিত বাস করিতেছিলেন বলিয়া স্বামিজীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে তাঁহার আদৌ মন ছিল না। অবশেষে তাঁহাকে যাইতে হইল।

* * * *

একদিন প্রাতে স্বামিজী গুডউইনকে বলিলেন, "শরৎ আমেরিকাতে যাবে, তুমিও এর সঙ্গে যাও। শরৎ নতুন লোক, আমেরিকার হালচাল জানে না। তুমি সঙ্গে থাকলে শরতের অনেক উপকার হবে।" গুডউইন বলিল, "আমার ত ওখানে থাকার খরচা নেই!" স্বামিজী বলিলেন, "ওর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমিই দোব।" প্রথমে সে কিছুতেই টাকা নিতে রাজি হয় নি, পরে সম্মত হয়। পুনরায় স্বামিজী তাহাকে বলিলেন, "মহিমকেও (বর্ত্তমান লেখক) সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমরা তিন জনে একসঙ্গে ওখানে চলে যাও। লণ্ডন অপেক্ষা নিউইয়র্কে অনেক কিছু শিক্ষা করবার বিষয় আছে। ওখানে সব সময়েই একটা স্বাধীন শক্তিপূর্ণ ভাব রয়েছে; কিন্তু লণ্ডনে মানুষ এত সতেজ হয় না। আরও একটা সুবিধা

আছে যে, সেখানে অমুকের বাড়ীতে থাকলে, তোমাদের তারা খুব যত্ন করবে।” স্বামিজীর এই সময় ইলেক্‌ট্রিসিটির উপর বড় আস্থা ছিল। আমেরিকাতে ইলেক্‌ট্রিসিটির কলকব্জা ও নানা প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি বলিতেন, “America is full of electricity, আমেরিকা দেশটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ।” তাঁহার তখন ইচ্ছা ছিল যে, ভারতীয়গণ আমেরিকায় ইলেক্‌ট্রিসিটি শিক্ষা করিয়া ভারতে সেই ধারা প্রচলিত করিতে যত্নবান হউক। ভারতবর্ষে ইলেক্‌ট্রিসিটির কাজকর্ম্ম চলিলে দেশের বহু কল্যাণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস। এইজন্য বর্ত্তমান লেখককেও পুনঃ পুনঃ আমেরিকায় গমন করিয়া ইলেক্‌টিসিটি শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক তখন লণ্ডনের বিখ্যাত পাঠাগার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠ করিতেছেন, সেইজন্য উহা ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না।

গুডউইন বর্ত্তমান লেখককে আমেরিকাতে সাথী করিবার জন্য কয়েকদিন বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। কখনও মিষ্ট কথায়, কখনও গালাগালি দিয়া, কখনও বা হাস্য-কৌতুকে নানাভাবে উহার মত বদল করাইতে বৃথা চেষ্টা করিল। সে বলিল, “এখানে থাকলে তোকে মেরে ফেলব। চ, আমেরিকায় চ! সেখানে নতুন দেশ, নতুন ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাবি। ওখানে তোকে এডিসানের (Edison) কাজে নিযুক্ত ক’রে

দোব। আমার তার পরিচিত লোকের সঙ্গে জানা আছে।" কখনও সারদানন্দ স্বামী দুঃখিত ভাবে বলিতেন, "তাইত মহিম, লণ্ডনে আছি; স্বামিজীর লেকচার শুনছি। আবার এখন এখান ছেড়ে আমেরিকায় যেতে হবে, সেখানে আবার লেকচার দিতে হবে! জানই ত আমার লেখাপড়া কিছুই জানা নেই। যা'হোক, স্বামিজীর আদেশ মত ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে একবার দাঁড়িয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। যদি ভাল হয়, সেখানে থেকে যাব। নইলে, এক চোঁচাঁ দৌড় মেরে কলকাতায় পালাব। এ সব উৎপাত কেন বাপু? দিব্বি মাধুকরী করবো, এক জায়গায় পড়ে থাকবো। এ আবার লেকচার করবার হাঙ্গামা মাথায় কেন গেল? আমি ত জীবনে কখনও লেকচার দিই নি,—তবে দাঁড়িয়ে একবার বলবো। আর গালমন্দ খাওয়া ত চিরকাল অভ্যাস আছে, না হয় আবার গাল খাব। তবে নরেন যখন বলছে তখন একবার চেষ্টা করবো।"

[অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সকলের জ্ঞাতব্যের জন্য এইস্থলে স্বামিজীর short temper-এর (খিটখিটে স্বভাব) কারণ লিখিত হইতেছে। তাঁহাকে সারাদিন ও অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "আমি যে রকম খাটি, তাতে দশটা লোকের মাথা পাগল হ'য়ে যায়। এখনও পর্য্যন্ত যে মাথাটা ঠিক আছে, এটাই আশ্চর্য্যের বিষয়!" এইজন্য মধ্যে মধ্যে তিনি খিটখিটে

স্বভাবের পরিচয় দিতেন। তাঁহার মহান্ শক্তির সমান তালে চলিতে অপরে কিছুতেই সক্ষম হইত না। কখনও সারদানন্দ স্বামীকে, কখনও বর্ত্তমান লেখককে, কখনও গুডউইনকে অজস্র তীব্র ভৎসনা-বাণী বলিতেন। শরীরে নানা কারণে ক্লান্তি বোধ করিলে তিনি ঐরূপ কঠোর বাক্য ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতেন। ঐ তিরস্কার-বাণী কাহারও মনে থাকিত না, কিম্বা কেহই উহার কোনরূপ প্রতিবাদ করিত না। যাঁহারা স্বামিজীর সহিত একত্রে বসবাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহা ছিল তাঁহার স্বভাবের একটি অঙ্গবিশেষ। কারণ শক্তিমানের শক্তির সামান্য একটু বিপর্য্যয় ঘটিলেই তাহার শরীর ও মনের বিশেষ যাতনা হইয়া ক্রোধের উদ্রেক হয়, কিন্তু ঐ ভাবটি ক্ষণমধ্যেই উপশমিত হয়। চিরন্তন ক্রোধ স্থায়ীরূপে হয় না। এই ভাবটির বিষয় জানা বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ স্বামিজী-চরিত্রজ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়। তাঁহার লিখিত পত্রাবলীতে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও পরিচয় বহু স্থানে বহুলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পলেরও (St. Paul) এইরূপ ক্রোধী স্বভাব ছিল। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী পাঠে ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। অনেকস্থলে পল প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ

করিয়া সকলকে গালি দিতেছেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই শান্ত হইয়া সকলকে মধুর স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ক্রোধী-স্বভাব শক্তিমানের একটা লক্ষণ, তাহাতে প্রতিহিংসা বা অবহেলার ভাব থাকে না। শক্তিহীন লোক মৃদু, বিনয়ী ও দাস্যভাবে অভিভূত হয়। স্বামিজী দাস্যভাবাপন্ন ছিলেন না; তিনি একজন প্রকৃত ডিক্টেটর-ভাবের লোক ছিলেন। সকল সময়েই তিনি ঐভাবে কথা বলিতেন, যথা—'my. people', 'my country'। একবচন ব্যবহার করিতেন, বহুবচন ব্যবহার করিতেন না। ক্রোধহীন, ধীর, নম্র, বিনয়ী ভক্তের ভাব লইয়া কেহ যেন স্বামিজীকে বুঝিবার চেষ্টা না করে। লেখক]

ক্রমেই আমেরিকা যাত্রার দিন সন্নিকট হইতে লাগিল। সারদানন্দ স্বামী বস্ত্রাদি একটা পোর্টম্যাণ্টোর মধ্যে রাখিয়া প্রস্তুত হইলেন। স্বামিজী গুডউইনকে কয়েক পাউণ্ড দিলেন। লিভারপুল হইতে জাহাজে চড়িয়া নিউইয়র্কে গমন করিতে হইবে। সব বন্দোবস্ত স্থির হইল। তিনি বলিলেন, "এখানে থাকার চেয়ে মহিমের, নতুন দেশ আমেরিকাতে যাওয়াই ভাল। ইংলণ্ডটা পুরান, এটা মস্ত বড় conservative place (রক্ষণশীল দেশ)। সব বিষয়ে কেমন একটা জড়সড় ভাব, পুরান চালে চলে। আমেরিকাটা full of electricity and life (ইলেক্ট্রিসিটি আর প্রাণ-শক্তিতে পরিপূর্ণ); ওখানে থাকলে লোকে আপনিই চনমনে হয়ে ওঠে। দেখ না

য়ুরোপের 'কন্টিনেন্ট' থেকে গরিব লোকগুলো পুঁটলি ঘাড়ে ক'রে নিউইয়র্কে নামলো! ভয়ে ভয়ে রাস্তা চলছে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, কোনও হোটেলে যেতে সাহস করে না। মাস দুই পরে দেখা গেল যে, সেই লোকটাই ভাল পোষাক পরেছে, গটমট ক'রে রাস্তায় চলছে, পুরাদস্তুর একটা স্বাধীন আমেরিকান হয়ে গেছে। আমেরিকানদের ভেতর একটা লাইফ আছে, একটা তেজ আছে। মহিমেরও ওখানে যাওয়া দরকার" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া স্বামিজী অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। গুডউইন তখন সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া, স্বামিজীর মত রাগ করিরা, ঘুসি পাকাইয়া বর্ত্তমান লেখককে বকিতে লাগিল, "মারব ঘুসি, দাঁত ভেঙ্গে দোব, নাক ভেঙ্গে দোব। চ' আমেরিকায়। তিনজনে মিলে যাব। জাহাজে খুব ফুর্ত্তি করব" ইত্যাদি। উত্তরে লেখক বলিলেন, "আমেরিকাতে সব ভাল বটে, কিন্তু লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামের লাইব্রেরি কুত্রাপি নেই। এটা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেতে ইচ্ছে নেই। তবে যদি একান্তই যেতে বলো তাহ'লে যাব।"

গুডউইন স্বামিজী প্রদত্ত জামা পরিল (অর্থাৎ গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত পোষাক পরিল)। সারদানন্দ তাহার মাথায় একটি কাপড় বাঁধিয়া দিল। আলমারির (cupboard) আরসিতে নিজের আকৃতি অনেকটা ভারতীয় মত হইয়াছে দেখিয়া সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। হঠাৎ তাহার মনে

হইল—লণ্ডন ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, বাড়ীর বুড়ী ঝির সঙ্গে দেখা করিয়া ঝগড়া করিতে হইবে! সে বড় কৌতুকপ্রিয় ছিল। ভারতীয় পোষাকটি পরিয়া সে নীচে রান্না ঘরে যাইয়া বুড়ীকে বলিল, "I am জ্ঞানী, জ্ঞানী। I am not ভক্ত।" বুড়ী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। বুড়ীকে রাগাইয়া কিছু পরে উপরে আসিল। পরদিন প্রাতে গুডউইন ও স্বামী সারদানন্দ লিভারপুল হইতে আমেরিকা উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। গুডউইনের মন জ্ঞানের দিকে বেশী আকৃষ্ট থাকায় উহার সন্ন্যাসী নাম ছিল "জ্ঞানানন্দ"।

লেখককে আমেরিকার বিষয়ে সারদানন্দ স্বামী পরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল। তিনি এক সময়ে গল্প করিতে করিতে বলিলেন, "আরে ভাই, আমি ত লেখা-পড়া ভাল জানতাম না, আর লেকচারও কখনও করি নি। কিন্তু নরেনের তাড়নার ভয়ে লেকচার দিতে হবে। আবার নরেন যে রকম রাগী—হয়ত সকলের সুমুখেই মেরে বসবে। ইংরাজিতে লেকচার দোব কি, ইংরাজিতে কথা কইতেই আমার আটকে আটকে যায়। কিন্তু কি করি, নরেনের হুকুম। মনে করলুম যে, আমেরিকায় গিয়ে একবার ত ভঙ্গী-টঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে লেকচার করতে উঠবো, পারি ত ভাল, না পারি ত অমনি জাপান দিয়ে সটকাব। আর এ মুখো আসব না। এক চোঁচাঁ দৌড় মেরে—দেশে গিয়ে পৌঁছাব। যা থাকে কপালে, বাবা, যখন সে বলেছে তখন যাত্রাদলের

দোঁহারের মত একবার গাইতে উঠব। গাওনা কেমন হবে, তা কিছুই জানি না। তারপর মনে পড়ল, গুডউইন বইগুলো ছাপাচ্ছে। তার ফর্ম্মাগুলো সঙ্গে নিয়ে জাহাজে বসে খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলুম—যেন একজামিন দিতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে খুব ক'রে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলুম। মনে মনে তাঁকে প্রার্থনা ক'রে বললাম—আমার না হোক, অন্ততঃ নরেনের যেন মুখরক্ষা হয়। কারণ নরেন আমাকে পাঠাচ্ছে, কাজ যদি খারাপ হয় তাহলে নরেনের দুর্নাম হবে। নিউইয়র্কে যথা সময়ে গেলুম। গুডউইন সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে, বোস্টন-এর নিকট কেম্ব্রিজ গ্রামে বিখ্যাত বেহালা-বাদক মিসেস অলিবুল-এর (Mrs. Olebull) বাড়ীতে নিয়ে গেল। অলিবুল জাতিতে সুইডিশ, ও আমেরিকান প্রজা ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত জীবনচরিত গ্রন্থখানি (Memoirs of Olebull by Mrs. Sarah C. Bull) আমাকে উপহার দেয়।" (বেলুড় মঠে ইহা প্রদত্ত হয়)।

যাহা হউক, উক্ত মিসেস বুলের বাড়ীতে একটি ছোট রকম ধর্ম্মসভার (Conference of Religion) অনুষ্ঠান হয়। অনেক সম্প্রদায়ের লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ফিলসফির বিখ্যাত পণ্ডিত প্রঃ জেমস (Prof. James) ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সারদানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সকলেই তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। ধীর, নম্র

ও বিনয়ী হওয়ায় তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। স্টার্ডি ও ফক্স-এর নিকট লণ্ডনে প্রথম দু'এক খানি পত্রে দেখা যাইত লেখা আছে, "ইনি বিবেকানন্দ স্বামীর মত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও খুব ধীর, নম্র ও বিনয়ী সাধু।" পরের পত্রে লেখা ছিল, "সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিতেছে"।

সারদানন্দ স্বামী একবার লেখককে বলিয়াছিলেন, "কোনও একটা স্থানে তাঁবুতে বড় একটা মিটিং হয়। এত বড় মিটিং-এ লেকচার দেওয়া পূর্ব্বে আমার অভ্যাস ছিল না; কিঞ্চিৎ চঞ্চল হই। সঙ্গী গুডউইন ত নাছোড়বান্দা। নানা-ভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল। লেকচারও এক রকম বলা হইল। সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে ও শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শুনিল। গুডউইনের আহ্লাদ দেখে কে!" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "গীতা ও চণ্ডীর ভাব লইয়া কয়েক মাস লেকচার দিলাম; ক্রমে ক্রমে সব ভাব শেষ হইলে মহা ফাঁপরে পড়লাম। একই কথা বার বার বললে লোকে শুনবেই বা কেন? ঠাকুরকে খুব ডাকতে লাগলাম, কয়েক-দিন পরে বুকে একটা অসীম সাহস এলো। নূতন উদ্যমে লেকচার করতে লাগলাম। বক্তৃতাও বেশ জমেছিল। অনেক লোকও শুনতে আসত। মুখও বেশ খুলে গেল। বাজারটাও জমেছে। মনে ভাবলুম যে, বছর কতক এখানে থাকবো। আরে বলব কি কপালের কথা, তোমার দাদার জন্যই ত সব

মাটি হ'য়ে গেল। হঠাৎ বেলুড় মঠ থেকে এক পত্র গেল,—তুমি আমেরিকান মহিলাদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এস। আদেশ-বাণী, কি করবো? লেকচার করা ত খতম হ'ল! তল্পিতল্পা গুছিয়ে আমেরিকার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চলে এলুম। আমার লেকচার পালাও সাঙ্গ হ'ল। বেশ কিন্তু সব জমেছিল। সব ভেঙ্গে গেল। আমি লেকচারও বুঝি না, কার্য্যও বুঝি না, স্বামিজীর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র কারণ। আমি আমার কাজ করেছি।"

এই সামান্য উপাখ্যান হইতেই বেশ বুঝা যায় যে সারদানন্দ, স্বামিজীকে কি গভীর শ্রদ্ধা-চক্ষে দেখিতেন—তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করা নিতান্ত দোষনীয় মনে করিতেন। মান, যশ, প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। স্বামিজীর প্রতি এইরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা অতি অল্পই দেখা যায়। অথচ তিনি সর্ব্ব কার্য্যে যোগ্য ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। ধীর ও বিনয়ী ছিলেন বলিয়া তিনি আত্মকথা ও আত্মশক্তি কখনও প্রকাশ করিতেন না। নিজের বিষয় কোনও কথা উঠিলে তিনি দীনভাবে উহা বন্ধ করিয়া দিতেন। এইটি ছিল তাঁহার বিশেষ মহত্ত্ব। তিনি যে একজন উচ্চাবস্থার লোক, বিনয়ী ও একনিষ্ঠ, স্বামিজীর বিশেষ অনুগত তাহা জীবনের বর্ণে বর্ণে প্রকাশ করিতেন।

———

সম্পাদকের দীপিকা

Immaculate Conception +

এই মতবাদটির মূল হইল লুক লিখিত Gospel (সুসমাচার)। যদিও সেণ্ট পল সাক্ষাৎভাবে Immaculate conception of Jesus সম্বন্ধে (যীশুর মাতৃগর্ভে প্রবেশকালীন নিষ্কলঙ্কতা) কিছু প্রচার করিয়া যান নাই কিন্তু তাঁহার শিষ্য লুকের সুসমাচারের উপর নির্ভর করিয়া উত্তরকালে এই মতবাদটি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইজন্য শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় লুকের গুরু সেণ্ট পলকে এই মতবাদটির প্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচনা করেন। Vicarious atonement, Resurrection প্রভৃতি মৃত্যুকালীন ব্যাপারগুলি নিজে প্রচার করিয়া ত্রাণকর্ত্তা যীশুর জন্মকালীন বৃত্তান্তটি (Immaculate conception) সেণ্ট পল, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও অনুবর্ত্তী লুককে দিয়া ঘোষণা করাইলেন।

[দ্রষ্টব্য বিষয়ঃ Birth of Jesus ; Virgin Birth ; Gospel according to Matthew (A Dictionary of Christ and the Gospels by James Hastings, D. D.). Luke ; Matthew (Bible Reader's Encyclopedia and Concordance by Rev. W. M. Clow, D. D.)]

Apocryphal Bible +

প্রচলিত বাইবেল +

Arian Controversy +

খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে Arian Controversyর (এরিয়াসের বিচার-বিতর্ক) ব্যাপারটি একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই বাদপ্রতিবাদ বা আন্দোলনের মূলে ছিলেন Arius (এরিয়াস)। অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার একটি প্রধান গির্জ্জার তিনি ছিলেন পাদ্রী। তাঁহাকে রাজা প্রথম-কনস্টানটাইন (Constantine I) যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা কনস্টানটাইন খৃষ্টমত অবলম্বন করার পর হইতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যীশুকে অবলম্বন করিয়া ঐতিহ্য-শাস্ত্র এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লিখিত গ্রন্থসমূহ পাদ্রীদের সাহায্যে লোকসাধারণে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইল। একটি কেন্দ্র বা মূলমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পাদ্রীদের ভিতর অতিশয় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কারণ Christianity হইল একটি মত-প্রধান ধর্ম্ম (creedal religion)। রাজা কনস্টানটাইন নূতন খৃষ্টান হইয়াছেন; তিনি এই গোলযোগের ফলে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি এত-শত বুঝিতেন না, বা সব জিনিষটা তলাইয়া দেখিবার অবসরও তাঁহার ছিল না। তিনি বলিলেন যে, তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া মূল মতটি সাব্যস্ত কর। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মূল মতটি সম্বন্ধে সকলে একমত না হইলে গির্জ্জার তথা খৃষ্টধর্ম্মের

উন্নতি ব্যাহত হইবে। শুধু তাহাই নয়; তিনি দেখিলেন, গির্জ্জায় গির্জ্জায় এই দলাদলির ফলে তাঁহার রাজ্যবিস্তার কার্য্যে বাধা পড়িবে। রাজা কনস্টানটাইন নিছক আধ্যাত্মিকতার প্রেরণায় খৃষ্টমত অবলম্বন করেন নাই (En. Br., Vol. 5 Page 697, Christianity ; এবং En. Br., Vol. 6 Page 301, Constantine দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, রাজা কনস্টানটাইনের উদ্যোগে কনস্টানটিনোপলের নিকট নাইসিয়াতে (Nicea) ৩২৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদিগের সর্ব্বপ্রথম বৃহত্তম ধর্ম্মসভার (First Ecumenical Council) অনুষ্ঠানটি সাধিত হয়। এরিয়াস ছিলেন ত্রিমূর্ত্তিবাদের বিরোধী-দলের লোক (Not-trinitarian, Alexandrian School. বর্ত্তমানলেখক-প্রদত্ত ভাষণ হইতে আমরা পাই যে, তিনি Ariusএর দলকে "Unitarian" অপেক্ষা "Not-trinitarian" সংজ্ঞাভুক্ত করার অধিক পক্ষপাতী)। অপরদিকে এরিয়াসের সমসাময়িক অ্যাথানেসিয়াস (Athanasius) প্রভৃতি ছিলেন অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার উগ্রপন্থী ত্রিমূর্ত্তিবাদের দলের লোক। এরিয়াসের মতবাদটি অত্যন্ত প্রবল ছিল। উত্তরকালের খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ যদিও এরিয়াসকে heretic (বিধর্ম্মী) বলিয়া অভিহিত করিতেছেন কিন্তু নাইসিয়ার (Nicea) সমসাময়িক কালে আমরা দেখিতে পাই, বিবদমান দলের একদল অপর দলকে heretic (বিধর্ম্মী) বলিয়া গালি দিতেছে। এরিয়াস একস্থানে বলিতেছেন যে, তাঁহার বিপক্ষ

দলের লোকেরা যতই সাজা দিন না কেন, তিনি মানিবেন না যে, 'as the God is eternal so is His Son'—when the Father, then the Son—the Son is present in God without a birth, ever begotten, an unbegotten-begotten ; an eternal God, an eternal Son ; the Son is God from himself." (En. Br., Vol. 2 Page 537, Arius দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে তিনি যে মতটি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্মটি পাঠক-পাঠিকাগণ এই গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। পুনশ্চ নিণ্ডারের লেখায় প্রকাশ পাইতেছে যে, "Arius thought, he was only unfolding the traditionary church doctrine" (Church Hist. by Neander, Vol. IV Page 25 অথবা En. Br., Vol. 2 P. 537)।

কয়েক দিবস বা সপ্তাহ ধরিয়া তুমুল বাদ প্রতিবাদ চলিবার পর (Dean Stanley বলিতেছেন, "We know not whether it lasted weeks or days" Eastern church, P. 129 অথবা En. Br. Vol. 6 P. 560. গিবনের মতে সভার কার্য্য নাকি দুইমাস ধরিয়া চলিয়াছিল।) নাইসিয়ার মহামণ্ডলীতে এরিয়াসের মতটি পরিত্যক্ত হয় এবং যীশু ও ত্রিমূর্ত্তিবাদ সম্বন্ধে একটি মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হয়।

অধিকন্তু, নাইসিয়ার মহামণ্ডলী দৃঢ় এবং আজ্ঞাপ্রদভাবে নির্দ্দেশ দিলেন যে, খৃষ্টজগতের যে-কেহ যীশুর মাহাত্ম্য

কিঞ্চিৎ-মাত্রও হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ঐ মূল সূত্রের শব্দগুলি বিপর্য্যস্ত করিবে অথবা সূত্র-ভিন্ন অন্য মত প্রকাশ করিবে তাহারই মস্তকে ঈশ্বরের তথা গির্জ্জার অভিসম্পাত (Anathema) বর্ষিত হইবে। ইহার ফল হইল এই যে, যীশুকে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিভিন্ন ঐতিহ্য ও লিখিত শাস্ত্রাদি প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল তাহার অনেকগুলিই apocryphal বা ত্যজ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কনস্টানটি-নোপলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহামণ্ডলীটি (Second Ecumenical Council of Constantinople in A.D. 381) নাইসিয়ার ভাবগুলিই যথাবৎ গ্রহণ করিয়াছিল। মূল সূত্রটি স্থাপন করিয়াই যদি ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে তত বলিবার থাকিত না কিন্তু নাইসিয়ার মহামণ্ডলীতে যে anathema ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহার ফলে, আমাদের বিবেচনায়, খৃষ্টান ধর্ম্মের ভিতর সঙ্কীর্ণ ভাব প্রবেশ করিল।

New Testament-এর (বাইবেলের নূতন নিয়ম বা কানুন) বিষয়-বস্তু সংকলন, মতান্তরে, নাইসিয়ার মহামণ্ডলীর কিছু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া তাহার পরেও প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং উক্ত মতানুসারে, লডিসিয়ার (Laodicea, Asia Minor) একটি ধর্ম্মসভায় (৩৬০ খৃঃ) ঐ সংকলন কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া যায়। St. John-এর Apocalypse এবং Epistle to the Hebrews লইয়া

যে মতভেদ চলিতে থাকে তাহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মিটিয়া যায়। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নাইসিয়ার মহামণ্ডলীর দৃঢ় নির্দ্দেশ ও পরিচালনার সাহায্য না পাইলে খৃষ্টজগৎ, মতবাদ তথা শাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। ইতিপূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত Old Testament-রূপ (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা কানুন) প্রামাণ্য শাস্ত্রের পার্শ্বে New Testamentকে সংস্থাপিত করা অত্যন্ত কঠিন হইত।

প্রাক্-নাইসিন যুগের এবং তাহার সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট খৃষ্টান বাবাজীগণ (Clement of Alexandria, Origen, Eraenius প্রভৃতি) যে সকল বাইবেলের (উত্তর কালে apocryphal বলিয়া ত্যজ্য) নাম উল্লেখ করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহারা যেগুলি আলোচনা করিতেন, তাহার অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহা পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ যে apocryphal bible গুলির উপর নির্ভর করিতেন তাহা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—

(১) Apostleগণ বা তাঁহাদের পার্শ্বদদের নামে প্রচারিত।

(২) Heathenদের (প্রচলিত খৃষ্টমতে অবিশ্বাসী) দ্বারা লিখিত।

ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও অভিসম্পাত, ইত্যাদি সহ্য করিয়া খৃষ্টজগতের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যে বইগুলি প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে আমরা পাই তিনটি বিষয়, যথা—(ক) যীশুর জন্মকালীন ঘটনা। (খ) যীশুর

শৈশব ও কিশোর বয়সের ঘটনা। (গ) যীশুর শেষ জীবনের ও মৃত্যুকালীন ঘটনা।

উপরোল্লিখিত দুই শ্রেণীর গ্রন্থই অলৌকিক কাণ্ড ও কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে নাকি দেখিতে পাওয়া যায় যে, যীশু আবশ্যক হইলে মারণ, উচ্চাটন, ইত্যাদি প্রয়োগ করিতেন (F. W. Farrarএর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, En. Br. Vol. 13 P. 659)। প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, উভয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির ভিতরেই পূর্ব্ব যুগের পণ্ডিতম্মন্য খৃষ্টান লেখকগণ স্ব স্ব অভিরুচি অনুযায়ী প্রক্ষেপ (interpollation) প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, মনুষ্যচিত্তের বিভিন্ন দুর্ব্বলতা লইয়া যীশু যে সাধনভজন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা কুত্রাপি পাইব না (শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গের সাধকভাব দ্রষ্টব্য)। যীশুর সাধক-জীবনের ত্রিশ বৎসরের বিবরণ নির্ণয় করিতে অধুনাপ্রাপ্ত 'apocryphal bible' গুলি বিশেষ কোন সাহায্য করে না। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বাধ্যায়গণের ঐ সকল পরিত্যক্ত বাইবেলগুলি লইয়া অধিকাধিক গবেষণা করা কর্ত্তব্য। ইহার ফলে এক দেশের ভাব, কথা ও কাহিনী ইত্যাদি সামান্য রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া অপর দেশে কিরূপে প্রচলিত হয় তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত, যীশুর জীবনী সম্বন্ধেও হয়ত নূতন আলোকপাত হইতে পারে। এই পরিত্যক্ত

বাইবেলের সংখ্যা প্রায় বাহাত্তরটি। বর্ত্তমান লেখক স্বয়ং ঐ' একটি apocryphal bible পাঠ করিয়াছেন।

পরিশেষে যে মতবাদটি খৃষ্টজগতে প্রায় আট শত বৎসর ধরিয়া অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত ছিল, নাইসিয়ার সেই মূল সূত্রটি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ঃ

Nicaeno-Constantinopolitan creed.

We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things, both visible and invisible; and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, only begotten, that is to say, of the substance of the Father, God of God, and Light of Light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made, both things in heaven and things on earth; who, for us men and for our salvation, came down and was made flesh, made man, suffered and rose again on the third day, went up into the heavens, and is to come again to judge the quick and the dead; and in the Holy Ghost.

[নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্টভাবে আলোচনা করা আবশ্যক ঃ En. Br. * Vol. 2 P. 537 Arius; Vol. 2 P. 828 Athanasius; Vol. 6 P. 298 Constantine; Vol. 6

* Encyclopedia Britannica, 9th. edition.

P. 510 Council ; Vol. 6 P. 558 Creeds ; Vol. 5 P. 688 Christianity ; Vol. 5 P. 819 Clement of Alexandria ; Vol. 2 P. 184 Apocrypha ; Vol. 3 P. 641 Bible ; Vol. 13 P. 656 F. W. Farrar লিখিত প্রবন্ধ "Jesus Christ". Gibbon's Roman Empire, Chap. XV, XVI, XX, XXI.]

Peter, Paul ও Thomas +

জু সম্প্রদায়ের স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের ভিতর খ্যাতনামা লোক ছিলেন Hillel. তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপক্ষদলের স্মার্ত্ত ছিলেন Shammai. Hillel-এর পৌত্র ও শিষ্যস্থানীয় ছিলেন Gamaliel I. এই স্মার্ত্ত পণ্ডিত Gamaliel I-এর শিষ্য ছিলেন Saul ওরফে Paul. যীশুর শিষ্যদিগের ভিতর একমাত্র Paul ছিলেন যথার্থ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত।

প্রামাণ্য-শাস্ত্র হিসাবে New Testamentকে (নূতন নিয়ম বা কানুন) সংস্থাপন করা, বাইবেলের নূতন ও পুরাতন কানুনের সম্বন্ধ নির্ণয় করা, ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া উত্তরকালে যে সকল প্রচেষ্টা চলিয়াছিল তাহার উপর সর্ব্বত্রই পলের প্রভাব দৃষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় পুরাতন কানুনই (Old Testament) ছিল খৃষ্টানদিগের প্রামাণ্য শাস্ত্র। তাহার পরের যুগে নূতন নিয়ম (New Testament) যখন ক্রমশঃ সঙ্কলিত ও কানুন-বদ্ধ হইতে লাগিল তখন এইভাব উঠিল যে, নূতন কানুনই হইল সর্ব্বেসর্ব্বা—পুরাতন কানুনের (Old Testament) কোনও

আবশ্যক নাই, অর্থাৎ সব দিক দিয়া একটা উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। তাহার পরের যুগের ভাব হইল—নূতন কানুন, পুরাতন কানুনের পরিপূরক। পুরাতন কানুনকে বুঝিতে গেলে নূতন কানুনের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। পুরাতন কানুনও খৃষ্টানদিগের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। এই সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন পল। পলের জীবনী ও পত্রাবলীর এবং তাহার সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাস অনুধাবন করিলে শ্রদ্ধেয় সারদানন্দস্বামী-কৃত পল সম্বন্ধে মন্তব্য-গুলির তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

Essene +

যীশু তিব্বৎ প্রভৃতি দেশসমূহে আসিয়াছিলেন কিনা সে প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া শ্রদ্ধেয় সারদানন্দ স্বামী এবং গ্রন্থকার যীশুর কার্য্যাবলী, হাবভাব ও প্রচারবাক্য হইতে প্রমাণ করিতেছেন যে, তিনি ভারতীয় ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

সংশ্লিষ্টভাবে John the Baptist ও যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে essene (সন্ন্যাসী) সম্প্রদায়ের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। প্যালেস্টাইনে essene-গণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেন। ইঁহাদের উদ্ভব হয় Asmonian-দের রাজত্বকালে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে (সম্রাট অশোকের পর)। Israel-এর ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই Asmonian-দের সময়েই আত্মতত্ত্ব,

পুনর্জন্মবাদ, দীক্ষা, সন্ন্যাস ইত্যাদি ভারতীয় (ইহুদী-মতে অশাস্ত্রীয়) ভাবসমূহ ইহুদীদিগের সম্প্রদায় বিশেষের ভিতর প্রবেশ করে। দৈনন্দিন জীবনযাপন-কালে essene সম্প্রদায়ের লোকেরা অহিংসা ও পরহিত ব্রত বিশেষভাবে পালন করিতেন। পুনর্জন্মবাদে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ইহুদী হইয়াও তাঁহারা যজ্ঞার্থে পশুবধ করিতেন না। দীক্ষার ব্যাপারটি তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন। সহসা কাহাকেও সন্ন্যাস দেওয়া হইত না। সংঘের মধ্যে থাকিয়া তিন বৎসর ব্রতচর্য্যা করার পর তবে সন্ন্যাস দেওয়া হইত। এইরূপ আরও অনেক ব্যাপারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণের সহিত সংঘভুক্ত essene-দিগের আচারপদ্ধতির সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। এই সাদৃশ্যের কারণ যে, বৌদ্ধ প্রভাব তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দেশ দেশান্তরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ধর্ম্ম প্রচারের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তর্ক-বিচারের দ্বারা নিজমতের উৎকর্ষ স্থাপন করিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ছিলেন সবার অগ্রণী। তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের ফলেই দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ মতগুলি ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মিলিন্দোপাখ্যান'টি যাঁহারা মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে উচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব নিরূপণ-বিষয়ে তখনকার দিনের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নিজ মতে অস্বাভাবিক ভাবে আগ্রহশীল ও পরমতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু জু'দিগের ভিতর উপরোল্লিখিত মতবাদগুলি প্রবেশ করাইয়া দিতে বৌদ্ধ জ্ঞানমার্গী

ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য ছিল না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রচারের ফলেই ইহুদীদিগের মধ্যে essene সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল।

স্বাধ্যায়গণ যদি পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমুদয় বিষয়গুলি বুঝিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা শ্রদ্ধেয় সারদানন্দ স্বামীর সিদ্ধান্তগুলির মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

[দ্রষ্টব্য বিষয় :—Essenes (En. Br. Vol. 8 Page 550) Gibbon's Roman Empire, Chapter XV.]

জন্‌ ও যীশু +

ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে, প্রচলিত বাইবেল হইতে যীশুর জীবনের ত্রিশ বৎসরের (বিশেষ করিয়া সাধক-জীবনের) ঘটনাবলী কিছুই জানা যায় না। কিন্তু একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যীশু যখন মহা ওজস্বীতার সহিত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন তখন হইতেই তাঁহার ভিতর ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি দ্যোষ্-পিতা—Father which art in heaven—শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার প্রচার-বাক্যে অদ্বৈতভাবের আভাস ইহুদীদের ধর্ম, তথা শীল্প ও সভ্যতার অত্যন্ত বিরোধী হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বরকে 'পিতা' সম্বোধন ইহুদীদিগের কানুন-সম্মত ভাব হইতে বিভিন্ন। তাঁহার নিজের প্রতি আরোপির্ত "Son

of Man" (নরসূনু) উপাধিটি প্রচলিত কানুন অনুযায়ী হয় নাই। শ্রদ্ধেয় সারদানন্দ স্বামী ও গ্রন্থকার ইহুদী মতের উপর আরোপিত এই সকল ভারতীয় ভাবগুলির প্রতি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

"Son of Man"-এর ব্যাখ্যা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের (খৃষ্টান ও ইহুদী) ভিতর অনেক বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই কিন্তু একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে,— It was not a current Messianic title. পুরাতন কানুনে (Old Testament) ইহার প্রয়োগ থাকিলেও ইহা কখনও অবতারের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। যীশু ইহা পাইলেন কোথা হইতে? সেইজন্য বক্তাদ্বয় মনুসংহিতার (সৃষ্টি-প্রকরণ ১-১০) প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

প্রক্ষিপ্তবাদী এবং অপরাপর পণ্ডিতগণের কথা বাদ দিয়া ব্যাখ্যাকারদিগের ভিতর যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন যে, যীশু "Son of Man" বাক্যটি স্ব-উপাধিরূপে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অর্থ নির্ণয়ের জন্য নির্ভর করেন, Old Testament-এর Daniel 7-13 সূত্রটির উপর। কিন্তু তাহাতেও মনোমত অর্থ নির্দ্ধারণ হয় না বলিয়া তাঁহারা আবার যীশুর প্রায় সমকালে রচিত ইহুদীদিগের দুইখানি প্রত্যাদেশমূলক (Apocalyptic) গ্রন্থের (Esdras এবং বিশেষ করিয়া Similitudes of the Book of Enoch) সাহায্য লন এবং উপরোক্ত Daniel 7-13-এর উপর একটি ভাষ্য যোজনা

করেন। এই ভাষ্যের সাহায্য লইয়া শেষোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ "Son of Man" বাক্যটি যে অবতারের যোগ্য উপাধি তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু যে গ্রন্থটির (Similitudes of the Book of Enoch) বিশেষ সাহায্য লইয়া অর্থ নিরূপণ করা হয় তাহার ভিতর, এক মতে, বহুল পরিমাণে খৃষ্টানী প্রক্ষেপ প্রবেশ করিয়াছে (The Jewish Encyclopedia Vol. 11 P. 461 'Son of Man' by Emil G. Hirsch, দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা, অবশ্য, অত্র প্রবন্ধের নিম্নে উদ্ধৃত বিষয়গুলি দেখিতে পারেন। কিন্তু এত ঘোরফেরের মধ্যে না গিয়া উপরে উল্লিখিত মনুসংহিতার (১-১০) সাহায্যে "Son of Man" এর অর্থ নিরূপণ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। প্রাচীন বৈদিক ভাব (হিরণ্য-গর্ভ, ব্রহ্মা) যে, "Son of Man" (নরসূনু) বাক্যটির ভিতর নিহিত আছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়।

প্রাচীন অনুলিপিকারদিগের ভ্রমবশতঃ বাইবেল চারিটির (Gospels) ভিতর কয়েকস্থলে "Man" এর পরিবর্তে "Son of Man" পাঠ চলিয়া আসিতেছে; ইহা সত্যই ভ্রমাত্মক। ব্যাখ্যাকার Rev. Gould-এর এই মতটি মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, "Son of Man"-এর অর্থনিরূপণটি মনুসংহিতার (১-১০) মতে হওয়া উচিত।

ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতের ভাবসমূহ কেবলমাত্র যে, Christologyর (খৃষ্টতত্ত্বের) মূল কয়েকটি বিষয়ে নিজ প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছে, এমত নহে। খৃষ্টানদিগের মেরীপূজা, দীক্ষাদান, আচার-পদ্ধতি (rituals), সাধু-সন্তদের পূজা ও তাঁহাদের পরিচ্ছদ-প্রণালী (costume) প্রভৃতি ব্যাপার-গুলিতেও (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) তাহার প্রভাব স্পষ্টভাবে পরি-লক্ষিত হয়।

খৃষ্টান সাধুসন্তদিগের ভিতর Josaphat নামে যে সন্তটি গ্রীক ও রোমান martyrologyতে (শহীদ-পঞ্জিকা) স্থান পাইয়াছেন, তিনি হইলেন আমাদের বোধিসত্ত্ব। খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশক "Barlaam and Josaphat" নামক গল্পটি মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ গল্পটিকে অবলম্বন করিয়া তখনকার দিনে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। কাহিনীটি কিন্তু আগাগোড়া বৌদ্ধ ব্যাপার, এমন কি স্থানে স্থানে (পণ্ডিত মোক্ষ মূলার প্রমাণ করিয়াছেন) ললিতবিস্তারের অনুবাদ। "Barlaam and Josaphat" নামক গল্পের সারাংশটি পড়িলেই স্বাধ্যায়গণ বুঝিতে পারিবেন যে, বুদ্ধ-জীবনীর ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিলিন্দো-পাখ্যানের ঘটনাগুলি আবশ্যক মত রদবদল করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য উহা লেখা লইয়াছিল।

যীশুমাতা মেরীর পূজা, অর্থাৎ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনার ব্যাপারটি ইহুদী ধর্ম্মের বিরোধী। পুনশ্চ ইহা নূতন কানুনের

(New Testament) উপর নির্ভর করিয়া হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে আর্য্য ধর্মের প্রভাব। এতদ্দেশীয় শক্তি উপাসনার কথা সর্ব্বজন-বিদিত। গ্রীক ও রোমানদিগের ভিতর আমরা পাই, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পূজা। মন্দিরে গ্রীক পূজারিণীগণ ইহার (Demeter, Ceres. লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য) পূজায় নিযুক্তা হইতেন। তাহার পর, আমরা দেখিতে পাই, রোম-নগরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও আপন আপন গৃহে Bona Dea-র (সুবচনী) পূজা করিতেছেন। পুরুষদের এই পূজায় যোগ দেওয়া নিষেধ ছিল বটে কিন্তু মেয়ে-মহলে এই সুবচনী বা Bona Dea-র পূজার বিশেষভাবে প্রচলন ছিল। এইরূপ ষষ্ঠীদেবীর ভাব সংযুক্ত হইয়া Aphroditeএর পূজা, বাস্তু বা গৃহদেবতার (Lares, Penates) পূজা, ইত্যাদি বহু দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা গ্রীক ও রোমানদিগের ভিতর প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয় Punic War-এর সময় হ্যানিবলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য Asia Minor হইতে Cybele দেবীর প্রতীকটিকে (একটি কাল উল্কাপ্রস্তর) মহা সমারোহে রোম নগরে আনা হইল, অর্থাৎ ঐ দেবীকে পূজা ও অর্চ্চনার দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তবেই রোমের চিরশত্রু হ্যানিবলকে বিধ্বস্ত করিতে পারা যাইবে। এই সময় হইতেই রোম নগরে Cybele বা Magna Mater (মহামায়ী) দেবীর পূজা খুব জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ইনি 'Great Mother of the Gods' নামেও অভিহিতা হইতেন। এই মহামায়ীর (ইনি সিংহবাহিনী) মন্দির

প্রতিষ্ঠার পর রোমানদিগের ভিতর উহা প্রধান ধর্ম্মস্থান বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। এই দেবী ও তাঁহার পূজার্চ্চনা যে, oriental cult তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

খৃষ্ট-মতের প্রাদুর্ভাবের পর প্রথম অবস্থায় আর্য্যধর্ম সম্মত (Aryan religion) এই সকল পূজা-অর্চ্চনার ভাব রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে, Nestorian প্রভৃতি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আপত্তি সত্ত্বেও ৪৫১ খৃষ্টাব্দে Council of Chalcedon-এ (নাইসিয়ার পর তৃতীয় মহামণ্ডলীতে) যীশুমাতা মেরীকে ঈশ্বরের মাতা রূপে প্রতিষ্ঠিতা করা হইল। অতঃপর ধীরে ধীরে মেরীপূজা ও অর্চ্চনার প্রসারণ হইতে লাগিল ও কালক্রমে উহা অতিশয় ব্যাপক আকার ধারণ করিল। অর্থাৎ Chalcedon-এর সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়া আর্য্যধর্ম্ম (Aryan religion) পুনরায় প্রবলভাবে নিজ শক্তি বিকাশ করিতে লাগিল। Magna Mater (মহামায়ী), মেরী-রূপে পূজা পাইতে লাগিলেন। প্রটেস্টণ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় মেরীকে শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার নামে পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি (Her Intercession on Bebalf of Mankind) অনুমোদন করেন না। কারণ এই আর্য্য ভাবটি পুরাতন কানুনের (Old Testament) বিরোধী ত বটেই, এমন কি যীশু বা তাঁর শিষ্যমণ্ডলী (Apostles) এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ করিয়া যান নাই। উত্তর কালে, মাতৃ-অঙ্কে

যীশু, স্তনন্ধয় যীশু ইত্যাদি মূর্ত্তিতে যে এতদ্দেশীয় মা যশোদার ভাব (বাৎসল্য) প্রবেশ করিয়াছে, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রদ্ধেয় সারদানন্দ স্বামী ও গ্রন্থকারের বিবক্ষিত সিদ্ধান্তগুলি সম্মুখে রাখিয়া ভাবধারা অনুসরণ করিয়া যাইলে আমরা অধিকতররূপে দেখিতে পাইব যে, আর্য্য, বিশেষ করিয়া ভারতীয় ভাবসমূহ বহুল পরিমাণে খৃষ্টান ধর্ম্মের ভিতর আরোপিত রহিয়াছে।

[দ্রষ্টব্য বিষয় : A Dictionary of Christ and the Gospels. Edited by James Hastings Vol. I P. 581, "Father, Fatherhood"; Vol. II P. 659, "Son of Man" by G. P. Gould.

The Jewish Encyclopedia (In 12 vols. Published by Funk and Wagnalls Company) Vol. 11 P. 461, "Son of Man" by Emil G. Hirsch.

Barlaam and Josaphat (En. Br. 9th. edition, Vol. 3 P. 375 and En. Br. 14th. edition, Vol. 3 P. 115)

Mary, (En. Br. 9th. edition Vol. 15 P. 589). Magna Mater, Great Mother of the Gods, Cybele সম্বন্ধে En. Br. 14th. edition এবং The Religious experience of the Roman People by W. W. Fowler দ্রষ্টব্য।

Bona Dea : Smith's Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

Cæsar, Cicero প্রভৃতির বাড়ীতে Bona Dea পূজা : Long's Decline of the Roman Republic এবং Social Life in the age of Cicero by W. W. Fowler দ্রষ্টব্য।

Aphrodite, Lares, Penates, Demeter, Ceres : Smith's Classical Dictionary.]

Crusade +

পোপ দশম লিও (Leo X) অত্যন্ত অসংযত চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার Sale of Indulgenceএর ফলে লুথারের Reformation প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল (Historians' Hist. of the World Vol. 9 P. 439)।

Cæser Borgia, মতান্তরে, পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের পুত্র (A History of Papacy by M. Creighton, New edition Vol. 4 P. 186-87)।

Sale of Indulgence

ত্রাণকর্ত্তা যীশু মানবকুলের আদিম পাপ (Original Sin) ও তজ্জন্য দুঃখভোগ, নিজে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। যে কেহ খৃষ্টমতে বিশ্বাসী তাহার আর ওসম্বন্ধে ভাবিতে হইবে না। কিন্তু আদিম পাপ ব্যতীত অন্যান্য পাপ যদি ইহজীবনে করা

যায়, তাহার কি হইবে? Purgatoryতে (প্রেতলোকে) অপেক্ষা করিয়া তাহার জন্য যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহার কি উপায় করা যায়? তখন কথা উঠিল যে, ত্রাণকর্ত্তা যীশুর শক্তি এত অধিক যে, মানবকুলের আদিম পাপ খণ্ডাইবার পরেও অতি-বিস্তর শক্তি উদ্বৃত্ত আছে এবং তাহা রোমের গীর্জ্জায় জমা আছে। অর্থাৎ রোমের গীর্জ্জার শরণাপন্ন হও এবং তত্রত্য মোহান্তের নিকট নিজ পাপ ব্যক্ত কর। তিনি সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার হস্তে গচ্ছিত যীশুর পাপমোচনের শক্তির খানিকটা তোমাকে দিবেন, যাহার ফলে প্রেতলোকে তোমার শাস্তি হইবে না, অথবা খুব অল্পের উপর দিয়া তুমি পরিত্রাণ পাইবে। প্রথম যুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাপকারীদের জপ, তপ, কৃচ্ছ্র সাধন ইত্যাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করান হইত কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে যীশুর পাপমোচনের গচ্ছিত শক্তি রীতিমত ক্রয় বিক্রয় হইতে লাগিল।

যীশুর জন্মমাস +

ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, যীশুখৃষ্ট শীতকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী ও শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয় খৃষ্টানদিগের উৎসবাদির মূল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা পোপ প্রথম গ্রেগরির ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছেন।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগে কোনও উৎসবাদির প্রচলন ছিল না।

খৃষ্টান আদিগুরুগণ এবং প্রাচীনকালের বাবাজীগণ (Early Fathers) কোনও পালপার্ব্বণ বা উৎসবাদি পালন করিতেন না এবং এ সম্বন্ধে কোনও নির্দেশও দিয়া যান নাই। যে সকল জু খৃষ্টমত অবলম্বন করিল, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বাচরিত উৎসবাদি—যেগুলি খৃষ্টমতের সহিত সামঞ্জস্য হয়—প্রচলন করিতে চেষ্টা করিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে Easter (যীশুর তিরোভাব) পার্ব্বণটির মূল হইল ইহুদীদের Passover উৎসব। মনীষী বিড (Bede) কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও তৎসংলগ্ন দেশসমূহে জংলীদের ভিতর "Eastora" দেবীর (বসন্ত রাণী) একটি উৎসব মহাসমারোহে পালিত হইত। মনীষী বিডের মতে, খৃষ্টান হওয়ার পর তাহাদের "Eastora" উৎসবটাই জংলীরা খৃষ্টধর্ম্মের ভাবসকল সংযুক্ত করিয়া পালন করিতে লাগিল। এই মতটি Historians' History of the World গ্রন্থেও (Vol. 18 P. 44) স্বীকৃত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত হুইট্‌বির মঠে (Abbey of Whitby) অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভাটি (Synod of Whitby) ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হুইট্‌বির মঠের প্রতিষ্ঠাত্রী অর্হতী হিল্ডার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। মতান্তরে উক্ত সভাটি ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আহূত হইয়াছিল। এই মতানুসারে একদিকে Irish ও Early Celtic Church-এর এলাকাভুক্ত গীর্জ্জাগুলি (আয়র্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত গীর্জ্জাগুলি)

এবং অপরদিকে Roman Church-এর (রোমের গীর্জ্জার অন্তর্ভুক্ত গীর্জ্জাগুলি) ভিতর Easter পার্ব্বণটির তারিখ নির্ণয় লইয়া বড়ই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। Synod of Whitbyতে ইহার মীমাংসা হয়। Irish এবং Early Celtic Church-গুলি কিন্তু বহুবর্ষ যাবৎ রোমের গীর্জ্জার নির্দ্দেশমত কার্য্য করে নাই। হুইট্‌বির ধর্মসভায় মস্তকমুণ্ডনের (tonsure) প্রথা লইয়াও বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

খৃষ্টানদিগের অন্যতম উৎসব Christmas-এর (যীশুর আবির্ভাব) মূল হইল, Feast of the Rising Sun—উত্তরায়ণ উৎসব। প্রাচীন কাল হইতে জংলীদের দ্বারা আচরিত এই উৎসবটি, কিঞ্চিৎ রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া রোমরাজ্যে Saturnalia, অর্থাৎ শনিরাশির উৎসবে পরিণত হয়। এইরূপ ঐতিহ্য আছে যে, Romulus উৎসবটিকে বলিতেন, Brumalia (Bruma : winter solstice)। উৎসবটি ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া প্রায় ৭।৮ দিন ধরিয়া সম্পন্ন হইত। উত্তরায়ণ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল, নূতন-অগ্নি প্রজ্জ্বলন বা সংস্থাপন করা। Christmas-এর সময় Yule log প্রজ্জ্বলিত করা, Christmas candle জ্বালান প্রভৃতিতে আমরা উত্তরায়ণ উৎসবের চিহ্নসকল অদ্যাপি দেখিতে পাই।

পোপ গ্রেগরি প্রমুখ (Pope Gregory I) খৃষ্টানদিগের খৃষ্টমত প্রচারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে

পাইব, মনুষ্যসমাজে Natural religion (প্রাকৃত ধর্ম্ম) এবং Ancestral religion-এর (পুরুষানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম) প্রভাব কত অধিক। পোপ গ্রেগরি উহা বুঝিয়া চলিতেন বলিয়া তাঁহার প্রচারকার্য্য অনেক সময় সাফল্যমণ্ডিত হইত। যে সকল স্বাধ্যায়গণ ভাবরাজ্যের দিক দিয়া প্রাকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রণীত "Natural Religion" নামক পুস্তকটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

[দ্রষ্টব্য বিষয় ঃ Festivals (En. Br. Vol. 9 P. 116)
Saturnalia (En. Br. Vol. 21 P. 321)
Christmas Day (En. Br. Vol. 5 P. 704)
Easter (En. Br. Vol. 7 P. 613)

Green's History of the English People, Vol. I Pages 55-56 দ্রষ্টব্য।

A Dictionary of English History, compiled by Sir Sidney Low and another. Cassell & Co. Ltd. (1928) গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য ঃ

Whitby (P. 1110)
Church of Ireland (P. 261)
Early Celtic Church (P. 266).]

পরিশিষ্ট

স্বাধ্যায়গণের গবেষণাকার্য্যে সুবিধা হইবে বলিয়া শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়ের ভাষণ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংকলিত করিয়া দেওয়া হইল। সঃ

১। Our Father which art in heaven : দ্যৌষ্-পিতা। ইন্দ্র : Zeus : Jupitor.

২। May pole : পুরুহূত-ধ্বজ : ইন্দ্রধ্বজ।

৩। Christmas tree : কল্পতরু।

৪; Belfry—গ্রীক, রোমান, ইহাদিগের ভিতর নাই। Saxonদের ভিতর ছিল। ইহা বৌদ্ধ চিহ্ন। রাশিয়ানদিগের গীর্জাতে তিনটা গম্বুজ হয় (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ); সাদা রং।

৫। ঘণ্টা বাজান—রোমান, গ্রীক, ইহুদীদিগের ভিতর নাই। ইহা ভারতীয় ভাব।

৬। Esseni (সন্ন্যাসী)—ইহুদীদিগের (প্রাচীন) ভিতর ছিল না। পুনর্জন্মবাদ esseni-দিগের সময় হইতে প্রবেশ করে।

৭। Pew, High Altar—বৌদ্ধ প্রথা।

৮। Chapter (জ্ঞানমণ্ডপ), যেখানে শাস্ত্র পাঠ হয়। Auditorium : সংঘারাম।

৯। Pope, papas, padri : বাবাজী। সাধুকে বাবা অথবা বাবাজী বলা, এতদ্দেশীয় প্রথা।

১০। Saint : সন্ত।

১১। Bishopরা surplice (ইহা নিম্ন বা আদ্দি কাপড়ে হয়) পরে। আস্তিনের ডগা তিন কোণা হয়। বুকে ও পিঠে কালো রুমাল দিয়ে ত্রিকোণ করে। ইহা ঘট স্থাপনের সময় ত্রিকোণ চিহ্ন করার প্রথা।

১২। Baptism (Aptism) : জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে নিমজ্জন করা। (See Renan)।

১৩। Nun, Nunnery : ভিক্ষুণী, ভিক্ষুণীর স্থান।

১৪। Friar, monk : ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী।

১৫। Tonsure : মস্তকমুণ্ডন (বৌদ্ধ প্রথা)।

১৬। Adam and Eve : অসুর জাতীয় Ea (Earth) ও Anu (Firmament)।

১৭। Angel : অসুরদিগের beaked headed, human faced, winged man.

১৮। St. Bo—বৌদ্ধ।

১৯। Marriage of St. Catharine : যুগল-মিলন। Royal Art Galleryতে ছবি আছে।

২০। ইহুদীরা ও আরবরা সূর্য্য অস্ত থেকে দিন গণনা করে। য়ুরোপীয়েরা মধ্য রাত্রি থেকে করে। হিন্দুরা প্রভাত সূর্য্য থেকে ক'রে।

২১। John the Baptist সম্প্রদায়কে Sabian বলে। আমি Busra, Amara, Bogdad অঞ্চলে ইহাদের অল্প সংখ্যক দেখিয়াছি। Tigris ও Euphrates-এর নিকটেও অল্প সংখ্যক দেখিয়াছি।

২২। যীশু essene ছিল। গৈরিক কাপড় পরিত এবং সন্ন্যাসী ছিল। Cunningham Geikieর বইয়ে আছে।

২৩। Seamless cloak অদ্যাপি আরবরা ব্যবহার করে। ইহাকে আবায়া বলে।

২৪। Damascusএর প্রাধান্য হইবার পূর্ব্বে, Antioch নগরে ক্রীশ্চান শব্দটা অবজ্ঞার্থে ছিল। যীশু-সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করিয়া ক্রীশ্চান বলিত। রোম নগরে যখন ক্রীশ্চান সম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়, মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ সমাধি গৃহে প্রার্থনা করা হইত। এইজন্য গীর্জ্জাতে অনাবশ্যক cellar নির্ম্মিত হয়।

২৫। Constantine-এর সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে হইত। অধিকসংখ্যক সৈন্য পাইবে বলিয়া অবজ্ঞাত ক্রীশ্চান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং ক্রীশ্চানদিগকে সৈন্যভুক্ত করিল এবং তদবধি Cross ধর্ম্ম-চিহ্ন হইল। (See Gibbon)।

২৬। ক্রীশ্চানরা আন্দাজ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে Old Testamentটা নিয়ে নিলে।

২৭। স্মার্ত্ত পণ্ডিত Hillel আর Shammai। Hillel-এর শিষ্য Gamaliel। Gamliel-এর শিষ্য Saul ওরফে Paul।

২৮। Matthew হ'চ্ছে levi. Matthewর original Hebrewতে লেখা বই নষ্ট হ'য়ে যায়। Paul-এর প্রেরণায় Luke লেখে।

২৯। St. John অনেক বৎসর বেঁচেছিল। বোধ হয় তিরানব্বই বৎসর।

৩০। Jordanএ সন্ধ্যার সময় একটা গীর্জ্জার ভেতর ঢুকেছিলুম। ধুনোয় অন্ধকার—তিনটি মূর্ত্তি। এত ধুনো দিয়েছে যে, মূর্ত্তি ভাল ক'রে দেখতে পেলুম না। দেখছি আর ভাবছি—আমি কোথায় আছি! মন্দির ব'লে ভুল হ'য়েছিল।

৩১। Barlaam ও Josaphat (বোধিসত্ত্ব)। রোমান ক্যাথলিকদের ভেতর এদের পূজা হ'য়ে থাকে।

ভিক্ষু ও রাজা মিলিন্দ। বুদ্ধ ঘোষের লেখায় মিলিন্দো-পাখ্যানের উল্লেখ আছে। ও বইটাতে দর্শনটা ন্যায় দিয়ে বোঝান হ'য়েছে। কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! ভারতবর্ষের মাথাটা কতটা উঁচুতে উঠেছিল ও বইখানি তার নিদর্শন।

৩২। Passion play : হর্ষবর্দ্ধন বুদ্ধের লীলা অবলম্বনে অভিনয় প্রণয়ন করিয়াছিল। পাঞ্চাল দেশে এই অভিনয় হইয়াছিল, এইজন্য বাংলায় কথাটা 'পাঁচালী' হ'য়েছে। অনেক জায়গায় এই অভিনয় বা লীলা-অভিনয় বা পালাগান হইত। ইহা অদ্যাপি বাংলায় ও উড়িষ্যায় হইয়া থাকে। ইহা হর্ষবর্দ্ধন, বুদ্ধের জীবনের লীলা জনসাধারণে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অবলম্বন করিয়াছিল। য়ুরোপে মধ্যযুগে ক্রীশ্চান সন্ন্যাসীরা এই উপায়

অবলম্বন করিয়া Passion play বা যীশুর নিপীড়ন অবলম্বনে পালাগান রচনা করিয়া জনসাধারণে প্রচার করিয়াছিল। ইহা বেশ দেখা যাইতেছে, ভারতীয় ভাব য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৮৯৮-৯৯ সালে আমার ইস্পাহান অবস্থান কালে, হোসেনের মৃত্যু অবলম্বনে এই পালাগান বহুবার দেখিয়াছি। যে সময় বাংলায় মহরম সেই মাসে হোসেনের মৃত্যুসময় পালাগান হইয়া থাকে। ইহা হৃদয়গ্রাহী ও শোকোদ্দীপ্ত ভাব। ইহা ভারতীয় সিয়া মুসলমানদের ভিতর প্রবর্ত্তন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। যাহা হউক, Passion play হর্ষবর্দ্ধনের লীলা-অভিনয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল।

৩৩। বাইবেলে যে সব গ্রাম বা স্থানের বর্ণনা আছে, অদ্যাপি ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যে বা topographyতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে যে exhibition হয় তাতে সিলোনের এক দল (বৌদ্ধ) গিয়েছিল। সেই দলের এক স্ত্রীলোক একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। ছ'দিনের (ষষ্ঠী) দিন ছেলেটিকে নাওয়ালে। Max Muller তাই দেখে বললে, "দেখ, এই হ'চ্ছে baptism-এর মূল—জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন।"

৩৫। ওদেশে জু'দের খাওয়া দেখেছি। একটা আট-কোনা টেবিল—ভাঁজ ক'রে মুড়ে রাখা যায়। তার একটা কব্জাওলা পায়া বা খুরো, সেটাও মুড়ে তুলে রেখে দেয়। খাবার ঠিক আগটায় পায়ার ওপর টেবিলটা পেতে নেয়। টেবিলের মাঝ-

২৮। Matthew হ'চ্ছে levi. Matthewর original Hebrewতে লেখা বই নষ্ট হ'য়ে যায়। Paul-এর প্রেরণায় Luke লেখে।

২৯। St. John অনেক বৎসর বেঁচেছিল। বোধ হয় তিরানব্বই বৎসর।

৩০। Jordanএ সন্ধ্যার সময় একটা গীর্জ্জার ভেতর ঢুকেছিলুম। ধুনোয় অন্ধকার—তিনটি মূর্ত্তি। এত ধুনো দিয়েছে যে, মূর্ত্তি ভাল ক'রে দেখতে পেলুম না। দেখছি আর ভাবছি—আমি কোথায় আছি! মন্দির ব'লে ভুল হ'য়েছিল।

৩১। Barlaam ও Josaphat (বোধিসত্ত্ব)। রোমান ক্যাথলিকদের ভেতর এদের পূজা হ'য়ে থাকে।

ভিক্ষু ও রাজা মিলিন্দ। বুদ্ধ ঘোষের লেখায় মিলিন্দো-পাখ্যানের উল্লেখ আছে। ও বইটাতে দর্শনটা ন্যায় দিয়ে বোঝান হ'য়েছে। কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! ভারতবর্ষের মাথাটা কতটা উঁচুতে উঠেছিল ও বইখানি তার নিদর্শন।

৩২। Passion play: হর্ষবর্দ্ধন বুদ্ধের লীলা অবলম্বনে অভিনয় প্রণয়ন করিয়াছিল। পাঞ্চাল দেশে এই অভিনয় হইয়াছিল, এইজন্য বাংলায় কথাটা 'পাঁচালী' হ'য়েছে। অনেক জায়গায় এই অভিনয় বা লীলা-অভিনয় বা পালাগান হইত। ইহা অদ্যাপি বাংলায় ও উড়িষ্যায় হইয়া থাকে। ইহা হর্ষবর্দ্ধন, বুদ্ধের জীবনের লীলা জনসাধারণে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অবলম্বন করিয়াছিল। য়ুরোপে মধ্যযুগে ক্রীশ্চান সন্ন্যাসীরা এই উপায়

অবলম্বন করিয়া Passion play বা যীশুর নিপীড়ন অবলম্বনে পালাগান রচনা করিয়া জনসাধারণে প্রচার করিয়াছিল। ইহা বেশ দেখা যাইতেছে, ভারতীয় ভাব য়ুরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৮৯৮-৯৯ সালে আমার ইস্‌পাহান অবস্থান কালে, হোসেনের মৃত্যু অবলম্বনে এই পালাগান বহুবার দেখিয়াছি। যে সময় বাংলায় মহরম সেই মাসে হোসেনের মৃত্যুসময় পালাগান হইয়া থাকে। ইহা হৃদয়গ্রাহী ও শোকোদ্দীপ্ত ভাব। ইহা ভারতীয় সিয়া মুসলমানদের ভিতর প্রবর্ত্তন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। যাহা হউক, Passion play হর্ষবৰ্দ্ধনের লীলা-অভিনয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল।

৩৩। বাইবেলে যে সব গ্রাম বা স্থানের বর্ণনা আছে, অদ্যাপি ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যে বা topographyতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে যে exhibition হয় তাতে সিলোনের এক দল (বৌদ্ধ) গিয়েছিল। সেই দলের এক স্ত্রীলোক একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। ছ'দিনের (ষষ্ঠী) দিন ছেলেটিকে নাওয়ালে। Max Muller তাই দেখে বললে, "দেখ, এই হ'চ্ছে baptism-এর মূল—জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন।"

৩৫। ওদেশে জু'দের খাওয়া দেখেছি। একটা আট-কোনা টেবিল—ভাঁজ ক'রে মুড়ে রাখা যায়। তার একটা কব্জাওলা পায়া বা খুরো, সেটাও মুড়ে তুলে রেখে দেয়। খাবার ঠিক আগটায় পায়ার ওপর টেবিলটা পেতে নেয়। টেবিলের মাঝ-

খানে একটা বাটিতে মাংসের স্তূপ আর তার চারদিকে গোছা করা রুটি রইল। টেবিলটা ঘিরে সকলে প্রায় হাঁটু-গেড়ে বসার মতন (বাঁ হাঁটুটা উঁচু থাকে আর ডান হাঁটুটা নীচু ক'রে রাখে) বসল। সর্ব্বপ্রথম রুটির গোছাটা (৪ খানা) তুলে নিলে। দু'হাতে ভাঁজ ক'রে ছিঁড়ে দু'আধখানা করবার পর ফের পাটে পাট মিলিয়ে দেয়—একটা আওয়াজ হয় (Breaking the bread)। তারপর আর এক ভাঁজ ক'রে ছিঁড়ে রুটি-গুলো চার টুকরো ক'রে ফেলে। রুটির একটা টুকরো ডান হাতের আঙ্গুলে ক'রে নিয়ে ঝোলে বোড়াল (Dip in the soup) ; ঝোলে কিন্তু নখ ঠেকাবে না। ভিজে রুটির টুকরোটা মুখে নিয়ে কাঠের চামচে ক'রে খানিকটা মাংস বা স্তূপ মুখে দিয়েই চামচেটা পাশের লোককে দিয়ে দেবে। একবারে যা উঠবে তাই মুখে দেবে ; চামচেটা দু'বার বুড়িয়ে বাটি থেকে মাংস তোলা অত্যন্ত অসভ্যতা। এই রকম ক'রে পর পর সবাই খেতে থাকবে।

র‍্যাফেলের ছবিটা (Last supper) পোপ দশম লিও-র dinner-এর নকল ক'রে আঁকা হ'য়েছিল। ওটা ঠিক হয় নি।

৩৬। গম ভাঙ্গা জাঁতা ওদেশে অন্য রকম। ওপরের অংশটা পাতলা নয়, খুব পুরু পাথরে তৈরী। গম দেবার দু'টা ছেঁদা। দু'জন স্ত্রীলোক মুখোমুখি ক'রে জাঁতার দু'দিকে বসল। একটা পা মুড়ে আর একটা পা সিধে রেখে থ্যাবড়ানি খেয়ে বসে। দু'জনে মিলে জাঁতা ঘোরাতে থাকে। কপালে

তাদের লাল ফিতা বাঁধা। জাঁতা ঘোরাচ্ছে আর মুখে সুর করছে—আ…ড়ি…বূ…ড়ি। জালতির দোলায় খোকাটিকে শুইয়ে রেখেছে; মাঝে মাঝে দড়িতে একটা টান দিয়ে দোলা দিচ্ছে।

৩৭। Adam একটা ফল গিলে খেতে গেল, কিন্তু সেটা গলায় আঁটকে গেল। Eve হাত বুলিয়ে দিতে নেমে গেল কিন্তু গলায় আঁটির চিহ্ন র'য়ে গেল (Adam's apple)।

তিনটা আম—রামের, লক্ষ্মণের আর হনুমানের। হনুমান নিজের আর লক্ষ্মণের ফলদু'টো খেয়ে ফেললে। কিন্তু রামের ফলটা খেতে গিয়ে গলায় আঁটকে গেল। সীতা হাত বুলিয়ে দেওয়ায় নেমে গেল কিন্তু গলায় চিহ্ন র'য়ে গেল। এই গল্পটি বাংলায় প্রচলিত; অন্যত্র নয়। একটা থেকে আর একটা এসেছে।

৩৮। Renan, Farrar, Geikie, Gibbon, এদের বই-গুলো পড়া আবশ্যক। Milman-এর History of the Jews বইখানাও পড়া দরকার।

লেখকের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান
২ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান
৩ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান
৪ ব্রজধাম দর্শন
৫ লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
(২য় ভাগ)
৬ পাশুপত অস্ত্রলাভ
৭ Lectures on Status of Toilers
(New Publication)
৮ Federated Asia
(In the Press)